গণদাবী

সোস্যালিস্ট ইউনিটি সেন্টার অফ ইন্ডিয়ার বাংলা মুখপত্র (সাপ্তাহিক)

৫৯ বর্ষ ১৮ সংখ্যা ২২ - ২৮ ডিসেম্বর ২০০৬ | প্রধান সম্পাদক ঃ রণজিৎ ধর | মূল্য ঃ ১.৫০ টাকা

সিঙ্গুরে তাপসী মালিকের মর্মান্তিক হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে গর্জে উঠুন

এস ইউ সি আই-এর আবেদন

১৮ ডিসেম্বর এক সাংবাদিক সম্মেলনে এস ইউ সি আই রাজ্য সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষ বলেন, সিঙ্গুরে চাষীদের জমি কেড়ে নেওয়ার জন্য সিপিএম ও তাদের সরকার ওখানে চাষীদের ওপর যে বর্বর আক্রমণ চালাচ্ছে, তার সর্বশেষ বলি হয়েছে কৃষিজমি রক্ষা আন্দোলনের একনিষ্ঠ সংগঠক আঠার বছরের তাপসী মালিক। ১৭ ডিসেম্বর সিঙ্গুরে শিশু-কিশোরদের অনশন অবস্থানেরও সে একজন সক্রিয় সংগঠক ছিল। গণধর্ষণ চালাবার পর তাকে নৃশংসভাবে হত্যা করা হয়েছে। গ্রামের মানুষ ভোরে প্রাত্যঃকৃত্য করতে মাঠে যায়, তাপসীও গিয়েছিল, কিন্তু আর ফেরেনি। ভোর সাড়ে পাঁচটায় জোর করে দখল করা জমির মধ্যে তার দেহ পাওয়া যায়। ওই জমি সরকার কাঁটাতার দিয়ে ঘিরেছে, সামনে পুলিশ ক্যাম্প, কিছু সমাজবিরোধীদেরও সিপিএম নিয়োগ করেছে ২৪ ঘণ্টা ওই জমি পাহারা দেওয়ার জন্য। মৃতদেহের চার পাশে ছিল চাপচাপ রক্ত, ছেঁড়া চুল ইতস্তত ছড়ানো, তাপসীর জিভ বেরিয়ে এসেছিল। শুধু তাই নয়, প্রমাণ লোপাট করার জন্য তাপসীর দেহে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয়। বাড়ির মানুষ এসে তার দেহ সনাক্ত করেন।

তাপসী মালিকের হত্যার প্রতিবাদে ১৮ ডিসেম্বর রাইটার্স বিল্ডিংস্-এর সামনে বিক্ষোভ

দিনরাত পাহারার মধ্যে কাঁটাতার ঘেরা জমির ভিতর এই ধর্ষণ ও হত্যাকাণ্ড ঘটতে পারল, কারণ ওই পাহারাদাররাই এই জঘন্য পাশবিক অপরাধের জন্য দায়ী।

সিপিএম নেতৃত্ব এত নিচুস্তরে নেমেছে যে, তারা রটাচ্ছে প্রেমে ব্যর্থতার জন্যই তাপসী নাকি আত্মহত্যা করেছে। আলিমুদ্দিন স্ট্রিট এখন গোয়েবলস্-এর দ্বিতীয় হেডকোয়ার্টারে পরিণত হয়েছে এবং সেখানেই তৈরি হয়েছে এই মিথ্যা রটনা। মিথ্যাচারে সিপিএম নেতৃত্ব নতুন নয়। ইতিপূর্বে যেমন মিথ্যাপ্রচার করেছিল যে, সিঙ্গুরে ২ ডিসেম্বর এস ইউ সি আই কর্মীরা ছুরি বোমা অ্যাসিড বাল্ব নিয়ে পুলিশকে আক্রমণ করেছিল বলেই নাকি পুলিশকে চাষীদের উপর অত্যাচার চালাতে হয়েছিল। আমরা জানি, জনগণ সিপিএমের মিথ্যাপ্রচারে বিভ্রান্ত হবেন না।

১৮ তারিখেই আমাদের দলের কর্মীরা তাপসী মালিকের হত্যার জবাব চেয়ে রাইটার্স বিল্ডিংসের সামনে বিক্ষোভ দেখিয়েছে। ২৯ জন গ্রেপ্তার হয়েছে, লাঠির আঘাতে অনেকে আহত হয়েছে,

সাতের পাতায় দেখুন

মহিলাকর্মীদের বিবস্ত্র করে মারল পুলিশ। ধিক্কার, বালুরঘাট নিষ্প্রদীপ

১৬ ডিসেম্বর বালুরঘাটের আপামর সাধারণ মানুষ সন্ধ্যায় ঘরের আলো বন্ধ রেখে তীব্র ধিক্কার জানালেন পুলিশি অত্যাচারের। এস ইউ সি আই আহ্বান জানালেও জনসাধারণ এদিন নিজেদের কর্মসূচি হিসাবে নিষ্প্রদীপ পালন করে বালুরঘাটে এক নতুন ইতিহাস সৃষ্টি করলেন।

রক্তাক্ত কমরেড নমিতা মহন্ত

গত ১৩ ডিসেম্বর দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার সদর দপ্তর বালুরঘাটের বুকে রচিত হল এক কলঙ্কজনক অধ্যায়। জেলাশাসকের দপ্তরের সামনে অগণিত সরকারি কর্মচারী ও বহু সাধারণ মানুষের উপস্থিতিতে যেভাবে আন্দোলনরত মহিলাদের শালীনতা-আব্রুকে পদদলিত করে বিবস্ত্র করে পশুর মতো টেনে হিঁচড়ে দোতলা থেকে সিঁড়ি দিয়ে পুলিশ নীচে নামিয়ে ছিল তা কোন সভ্য জগতে ঘটে না। সিঙ্গুরের চাষীদের জমি কেড়ে নেওয়ার প্রতিবাদে ডি এম অফিসে এস ইউ সি আই-এর জেলা সম্পাদক সাগর মোদকের নেতৃত্বে কর্মী-সমর্থকেরা সেদিন ডেপুটেশন দিতে এসেছিলেন। মিছিল বালুরঘাট শহর পরিক্রমা করে ডি এম অফিসে পৌঁছতেই পুলিশ ব্যাপকভাবে লাঠিচার্জ শুরু করে। লাঠিচার্জ করতে করতে মেইন গেটের বাইরে নিয়ে গিয়ে রাস্তা থেকে কর্মীদের গ্রেপ্তার করে। অন্যদিকে দোতলায় ডি এমের চেম্বারে কর্মীদের উপরে শুরু হয় বর্বরোচিত পুলিশি আক্রমণ। মেয়েদের শাড়ি সম্পূর্ণভাবে খুলে দিয়ে, কারও ব্লাউজ ছিঁড়ে দিয়ে নগ্ন আক্রমণ করে পুলিশ। এই আক্রমণে সেদিন আহত হন বহু কর্মী-সমর্থক। চারজনের আঘাত ছিল গুরুতর। কমরেড নমিতা মহন্তকে অচৈতন্য অবস্থায় হাসপাতালে ভর্তি করতে হয়। জেলা কমিটির সদস্য কমরেডস্ রঞ্জিত দেব, নন্দা সাহা এবং বাবলি বসাক গুরুতরভাবে আহত হয়ে পড়েন। ১৯ জন কর্মীকে পুলিশ গ্রেপ্তার করে এবং প্রত্যেকের বিরুদ্ধে একাধিক মিথ্যা কেস দেয়।

বিক্ষোভরত এস ইউ সি আই কর্মীদের উপর এই অমানুষিক আক্রমণ কিন্তু মেনে নেননি সেদিন কেউই। দলমত নির্বিশেষে প্রত্যক্ষদর্শী সকল সরকারি কর্মচারী ও জনসাধারণ তীব্রভাবে পুলিশকে ভর্ৎসনা করতে থাকেন এবং আহত এস ইউ সি আই কর্মীদের পাশে এসে দাঁড়ান। বালুরঘাট শহরে এবং জেলার সর্বত্র এই পাশবিক ঘটনার কথা প্রচারিত হলে প্রচণ্ডভাবে ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠেন

দুয়ের পাতায় দেখুন

‘আমাদের বাঁচতে দাও’— অবস্থানে শিশু-কিশোররা

টাটার দালালি করতে গিয়ে সিপিএম নেতারা শিশুদের শৈশবেও আঘাত করেছে। যে শিশুদের ‘সহজ পাঠ’ নিয়ে স্কুলে যাওয়ার কথা, খেলাধুলা করার কথা, আজ তারাও উদ্বিগ্ন— জমি নিলে খাব কী ? চর্ব্য-চোষ্য-লেহ্য-পেয়-তে আকণ্ঠ নিমজ্জিত মন্ত্রীরা। শিশুদের ভবিষ্যত নিয়ে তাঁদের ভাবার সময় নেই। তাই শিশুদেরও পথে নামতে হয়েছে দাবি নিয়ে। আন্দোলন, লড়াই, স্লোগান, প্রতিরোধ এসবই এখন শিশুদের সহজপাঠ। ১৭ ডিসেম্বর বারো হাত কালীতলা মাঠে স্কুল ছাত্রছাত্রীরা সামিল হয়েছিল গণঅবস্থানে। সংখ্যায় দু’শোরও বেশি হবে। দাবি একটাই, ‘আমাদের জমি ফিরিয়ে দাও’।

এই শিশুদের অনেকেরই বাবা মা দাদা দিদিরা পুলিশি অত্যাচারের শিকার। অনেকে সে অত্যাচার প্রত্যক্ষও করেছে। তাই শিশুদের চোখেমুখেও প্রতিবাদের ভাষা যেন স্পষ্ট হয়ে উঠছিল। এই অবস্থানের অন্যতম সংগঠক তাপসী মালিককে ওরা বাঁচতে দেয়নি। কিন্তু রয়েছে আরও হাজার হাজার!

সরকার শিল্পপতিদের প্রেমে আপ্লুত

বিধানসভায় দেবপ্রসাদ সরকার

২৯ নভেম্বর পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় রাজ্যের আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির উপর আলোচনায় অংশ নিয়ে এস ইউ সি আই পরিষদীয় নেতা কমরেড দেবপ্রসাদ সরকার বলেন,

আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির বিষয়ে যে প্রস্তাব এখানে এসেছে, আমি প্রথমে বলতে চাই, পশ্চিমবাংলার স্বঘোষিত ইন্ডাস্ট্রি-ফ্রেন্ডলি সরকার, অর্থাৎ শিল্পবন্ধু সরকার শিল্পপতিদের অবাধ লুণ্ঠন-শোষণ-অত্যাচারের সুবিধা করে দিতে শ্রমিক, কর্মচারী, কৃষক সহ সমস্ত অংশের খেটে খাওয়া মানুষের ওপর এক সর্বাত্মক আক্রমণ নামিয়ে এনেছে। পুলিশ-প্রশাসন এই সরকারকে পরিচালনা করছে। আজ দেশি-বিদেশি শিল্পপতিদের স্বার্থরক্ষা করার জন্য কৃষকদের বহু ফসলি জমি অধিগ্রহণ করা হচ্ছে। শুধু সিঙ্গুর নয়, পশ্চিমবাংলার জেলায় জেলায়, যেমন মেদিনীপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগণা, হাওড়া এরকম বিভিন্ন জেলায় তারা ২ লক্ষ একর জমি কৃষকদের থেকে কেড়ে নিতে চলেছে। এর ফলে গরিব চাষী, বর্গাদার, খেতমজুর তাদের বাঁচার ও জীবিকার অধিকার থেকে বঞ্চিত হচ্ছে, সর্বস্বান্ত হচ্ছে। শিল্পায়ন ও কর্মসংস্থানের ধাপ্পা দিয়ে, মিথ্যাচার করে তারা চাষীদের ওপর এই আক্রমণ নামিয়ে আনছে। সিঙ্গুরে চাষীদের বিরুদ্ধে রাজ্য সরকার কার্যত যুদ্ধ ঘোষণা করেছে। সিঙ্গুরে চাষীরা যাতে তাদের জমি রক্ষা করতে না পারে, ফসল ফলাতে না পারে, সেজন্য হাজার হাজার পুলিশ পাঠিয়ে, কমব্যাট ফোর্স পাঠিয়ে গোটা সিঙ্গুর পুলিশ দিয়ে ঘিরে রেখেছে। ২৫ সেপ্টেম্বর কী নৃশংস অত্যাচার হয়েছিল! সেখানে অবরোধ করে চতুর্দিকে আলো নিভিয়ে দিয়ে বাড়ি বাড়ি গিয়ে পুলিশ নির্মম নির্যাতন করেছিল। তাতে ২৩-২৪ বছরের রাজকুমার ভুল নামে একজন যুবক প্রাণ হারায়। আজকে সিঙ্গুরেই শুধু নয়, গোটা পশ্চিমবাংলার বিভিন্ন জেলায় জমি অধিগ্রহণ করার বিরুদ্ধে ব্যাপক গণআন্দোলন গড়ে উঠেছে।

গত ৯ অক্টোবর এর প্রতিবাদে সর্বাত্মক হরতাল, ধর্মঘট পালিত হয়েছে। সরকারের ন্যূনতম গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ যদি থাকতো তাহলে সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করত। কিন্তু সরকারের সেই মূল্যবোধ নেই। এমনকী টাটারা তাঁদের এতই বন্ধু যে, কী শর্তে, কী ছাড়ে টাটাদের জমি দেওয়া হবে সেটাও তাঁরা বলবেন না, শিল্পপতি প্রেমে এতই তাঁরা আপ্লুত হয়ে পড়েছেন। পুঁজিপতিদের সেবা করে তাঁরা ক্ষমতায় টিকে থাকতে চাইছেন। আজকে পশ্চিমবাংলার শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ, এমনকী মহাশ্বেতা দেবীর মতো প্রবীণ লেখিকা ক্ষোভের সঙ্গে বলতে বাধ্য হয়েছেন, 'সিঙ্গুরে যেভাবে হাজার একর জমি দখল করা হচ্ছে, হাজার হাজার পুলিশ পাঠিয়ে ফ্যাসিস্ট কায়দায়, এতে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের মুখ এবং বুশের মুখ এক এবং অভিন্ন।' দেশের কোটি কোটি চাষীর স্বার্থ ক্ষুণ্ণ করে যদি মুখ্যমন্ত্রী মনে করেন — টাটারা বাঁচাবে, আম্বানিরা বাঁচাবে, তাহলে ভুল করবেন। ইতিহাসে কিন্তু জনগণই শেষ কথা বলে। যেভাবে আপনারা শ্রমিক-কর্মচারী, কৃষক, সাধারণ মানুষের উপর আক্রমণ নামিয়ে আনছেন, তাতে দেওয়ালের লিখনের কথা আপনারা ভুলে যাবেন না। স্বৈরাচার কখনো শেষ কথা বলে না। আপনি মিথ্যাচার করছেন, চাষীরা যদি স্বেচ্ছায় জমি দিয়েই দেয়, তাহলে চাষীদের দমন করার জন্য হাজার হাজার পুলিশ পাঠাতে হচ্ছে কেন? পঁচিশ শতাংশ চাষী জমি দিয়েছে, বাকিটা জোর করে, জালিয়াতি করে দখল করার চেষ্টা করছেন। আপনার বিরুদ্ধে প্রিভিলেজ পর্যন্ত আনা যায়। আপনি হাউসকে ভুল তথ্য পরিবেশন করছেন, গোটা পশ্চিমবাংলার মানুষকে বিভ্রান্ত করছেন।

সিঙ্গুরে কৃষিজমি দখলের প্রতিবাদে বিক্ষোভ মিছিলের ডাক দেওয়া হয়েছিল ২৩ নভেম্বর চুঁচুড়ায় এস ইউ সি আইয়ের উদ্যোগে। শান্তিপূর্ণ মিছিল হচ্ছিল, ২০০ থেকে ২৫০ জন মানুষ ছিলেন। তাঁরা ডি এম অফিসে, কালেকটরেট অফিসে বিক্ষোভ দেখাতে যাচ্ছিলেন। চুঁচুড়ার ঘড়ির মোড়ের কাছে পুলিশ তাদের আটকে দেয়। ৪৫০ জন কমব্যাট পুলিশ ফোর্স চতুর্দিক থেকে তাঁদের ঘিরে ফেলে এবং বেপরোয়াভাবে লাঠিচার্জ করে। এতে ৪২ জন আহত হন, যার মধ্যে ৮ জন মহিলা। সত্তর বছরের একজন বৃদ্ধের কোমর ভেঙে গিয়েছে। পঞ্চাশ বছরের একজনের মাথায় আঘাত। সেই অবস্থায় পুলিশ তাদের গ্রেপ্তার করেছে। এইভাবে আপনারা পুলিশ দিয়ে গণআন্দোলনকে দমন করতে চাইছেন। বিদ্যুতের দাম বৃদ্ধির বিরুদ্ধে যখন আমরা আমরণ অনশন করেছিলাম, শেষ পর্যন্ত সেই আন্দোলনের সামনে আপনারা নতি স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছেন। আপনারা যদি মনে করেন, শিল্পপতিদের পৃষ্ঠপোষকতা করে আপনারা পশ্চিমবাংলার উন্নয়নের জন্য অনেক কাজ করছেন, তাহলে ভুল করবেন। জনগণ, এমনকী আপনার দলের যাঁরা সৎ কর্মী-সমর্থক তাঁরাও কিন্তু এই জিনিস সমর্থন করতে পারছেন না। দেওয়ালের লিখন আপনাদের ভুললে চলবে না। ক্ষমতার দম্ভে এত ঔদ্ধত্য ঠিক নয়। চাষীদের হত্যা করে, শ্রমিকদের হত্যা করে, গণতান্ত্রিক আন্দোলনকে দমন করার এই নীতি পরিত্যাগ করুন। যথার্থ বাম দৃষ্টিভঙ্গি থেকে সরকার পরিচালনা করুন। চাষের জমি অধিগ্রহণ করার নীতি প্রত্যাহার করুন। ব্যাপক যে জনমত, সেই জনমতকে মূল্য দিন।

'ভদ্রভাবে কথা বলুন!'

মুখ্যমন্ত্রীকে দেবপ্রসাদ সরকার

২৯ নভেম্বর বিধানসভায় আইন-শৃঙ্খলা সংক্রান্ত আলোচনার জবাবি ভাষণে মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য কমরেড দেবপ্রসাদ সরকারকে উদ্দেশ্য করে বলেন, "এই যে, কী যেন আপনার পার্টিটার নাম, ওটা তো সোস্যালিস্ট ইউনিটি সেন্টার অফ্ জয়নগর।" একথা শুনেই দেবপ্রসাদ সরকার উঠে দাঁড়িয়ে বলেন, "ভদ্রভাবে কথা বলুন। এখুনি প্রত্যাহার করুন যা বলেছেন। এত বড় ঔদ্ধত্য! টাটা, সালিম, আম্বানিদের নির্লজ্জ সেবা ও দালালি করে ন্যূনতম শালীনতা বোধটুকু পর্যন্ত হারিয়ে ফেলেছেন। সংসদীয় রীতিনীতি সবকিছু বিসর্জন দিয়ে মানসিক ভারসাম্য পর্যন্ত হারিয়ে ফেলেছেন। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর যদি এই কালচার হয় তাহলে তাঁর কাছ থেকে মানুষ কী শিখবে?"

উচ্ছেদের প্রতিবাদে ২৫ কিমি মশাল মিছিল নন্দীগ্রামে

রাজ্য সরকার হলদিয়া ডেভেলপমেন্ট অথরিটির মাধ্যমে পূর্ব মেদিনীপুর জেলার নন্দীগ্রাম-১নং ব্লকের ৩৮টি মৌজার প্রায় ১৯ হাজার একর জমি অধিগ্রহণের পরিকল্পনা নিয়েছে।

হলদি এবং হুগলি নদী তীরবর্তী এই বিস্তৃত এলাকার জমি অধিগ্রহণ করলে এই এলাকায় বসবাসকারী হাজার হাজার কৃষক এবং মৎস্যজীবী পরিবারকে তাদের পেশা এবং জমি থেকে উচ্ছেদ হতে হবে। তাই এর বিরুদ্ধে আন্দোলনে নেমেছে 'নন্দীগ্রাম থানা কৃষক উচ্ছেদ বিরোধী এবং জনস্বার্থরক্ষা কমিটি'। এই কমিটির আহ্বানে ২৪ নভেম্বর নন্দীগ্রাম ১নং ব্লকের দক্ষিণ সীমায় সোনাচূড়া থেকে উত্তর সীমায় ৫ম খণ্ড জালপাই পর্যন্ত দীর্ঘ প্রায় ২৫ কিমি রাস্তা জুড়ে মশাল মিছিল করা হয়েছে। মশাল মিছিল শুরু হয় চরকেন্দ্যামারী ফেরীঘাট থেকে। মিছিল উপলক্ষে ১০টি স্থানে সভা হয়। বিভিন্ন সভায় বক্তব্য রাখেন কমিটির সংগঠক এবং বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি। মিছিলে প্রায় দেড় হাজার মানুষ অংশগ্রহণ করেন।

কৃষক উচ্ছেদ বিরোধী এবং জনস্বার্থ রক্ষা কমিটির দাবি — শ্রমিক এবং কৃষক স্বার্থবিরোধী 'বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল আইন' বাতিল করতে হবে। এই বিপুল পরিমাণ জমির ব্যবহার সম্পর্কে শ্বেতপত্র প্রকাশ করতে হবে। পূর্বের উচ্ছেদ হওয়া সমস্ত পরিবারের অন্তত ১ জনের চাকরি এবং পুনর্বাসন দিতে হবে। শিল্পের নামে কৃষিজমি অধিগ্রহণ করে জমি কেনাবেচার ব্যবসা করা চলবে না।

সংগঠনের সভাপতি প্রফুল্ল মাইতির অভিযোগ, হলদিয়া এলাকার দেভোগে ১৯৭৮ সালে তাঁরা যে জায়গার দাম একর প্রতি ২৭০০ টাকায় পেয়েছেন, আজ সেই জায়গা একর প্রতি দেড় কোটি টাকায় লিজ দেওয়া হচ্ছে। এছাড়াও বিগবাজার, মার্কেট কমপ্লেক্স, হোটেল গড়ে উঠছে, অথচ তাঁরা পুনর্বাসন পাননি। সম্পাদক নন্দ পাত্র বলেন, সরকার যে মৌজাগুলোকে অনাবাদি চর বলে ঘোষণা করেছে সেই জায়গায় আমন চাষ ছাড়াও খেসারী, কলাই, নারকেল, পান বোরজ ও মাছ চাষ হয়। ফলে অধিগ্রহণ হলে হাজার হাজার পরিবার তাদের বাসস্থান ও জীবিকা হারাবে। সংগঠনের সহসভাপতি ভবানীপ্রসাদ দাসের অভিযোগ, নন্দীগ্রামের জেলিংহাম প্রোজেক্ট তৈরির সময় যে একুশটি পরিবার উচ্ছেদ হয়েছিল তাদের অধিকাংশই ক্ষতিপূরণ পাননি এবং কেউই স্থায়ী কাজ পাননি। সেই প্রোজেক্ট বন্ধ। ৩৫০ একর জায়গা পড়ে আছে।

আন্দোলনে মেদিনীপুর সুরক্ষা সমিতিও

২ ডিসেম্বর সিঙ্গুরের গরিব কৃষকদের কাছ থেকে জোর করে দু-তিন ফসলা জমি কেড়ে নেওয়ার এবং বর্বরোচিত আক্রমণ ও শ্লীলতাহানির প্রতিবাদে ৭ ডিসেম্বর মেদিনীপুর সুরক্ষা সমিতির আহ্বানে বিদ্যাসাগর মূর্তির পাদদেশে এক সভা অনুষ্ঠিত হয়।

সভাপতিত্ব করেন সমিতির কার্যকরী সভাপতি আশিস কিশোর চ্যাটার্জী। উপস্থিত ছিলেন ডাঃ ডি পি রায়, অশ্বিনী সেন, ভানুরতন গুইন, পঞ্চানন প্রধান, অধ্যাপক অশোক মুখার্জী, অধ্যাপক অরূপ দাশগুপ্ত, প্রণব বসু, সমিতির সম্পাদক তীর্থঙ্কর ব্যানার্জী, বিশ্বরঞ্জন মুখার্জী, অমল মাইতি, বেদান্ত চ্যাটার্জী, তীর্থঙ্কর ভকত প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। সমস্ত বক্তাই সিঙ্গুরে পুলিশি অত্যাচারের তীব্র সমালোচনা করেন।

এই প্রতিবাদ সভায় খড়্গপুর কৃষিজমি বাঁচাও কমিটির সম্পাদক বিবেকানন্দ সাহু বক্তব্য রাখেন। তিনি তথ্য তুলে ধরে বলেন, খড়্গপুরের কাছে জফলা, মালিপুর সহ বিস্তীর্ণ এলাকার প্রায় চার হাজার একর জমি একইভাবে শিল্পায়নের ধাপ্পা দিয়ে কেড়ে নেওয়া হচ্ছে। এর ফলে কৃষিজমির পাশাপাশি কয়েকশো আদিবাসী পরিবারকেও উচ্ছেদ হতে হবে। তিনি জানান, সরকারের এই ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে এলাকার মানুষকে সংগঠিত করে প্রতিরোধ আন্দোলন গড়ে তোলা হচ্ছে। মেদিনীপুর সুরক্ষা সমিতির সহযোগিতা আহ্বান করে বিবেকানন্দবাবু বলেন, যত অত্যাচারই হোক তাঁরা সরকারকে কিছুতেই এই কৃষিজমি কেড়ে নিতে দেবেন না।

বালুরঘাটে পুলিশি অত্যাচারের বিরুদ্ধে এ আই এম এস এসের বিক্ষোভ

সিঙ্গুরে কৃষিজমি অধিগ্রহণের প্রতিবাদে আন্দোলনরত সিঙ্গুরবাসীর উপর নারকীয় পুলিশি অত্যাচারের বিরুদ্ধে বালুরঘাটে জেলাশাসক অফিসের সামনে বিক্ষোভরত মহিলা আন্দোলনকারীদের সিপিএম সরকারের পুলিশ বিবস্ত্র করে যে পৈশাচিক অত্যাচার চালিয়েছে, তার তীব্র ধিক্কার জানিয়ে অল ইন্ডিয়া মহিলা সাংস্কৃতিক সংগঠনের পক্ষ থেকে ১৫ ডিসেম্বর সারা বাংলা প্রতিবাদ দিবসের ডাক দেওয়া হয়। তারই অঙ্গ হিসাবে কলকাতা জেলা কমিটি এক বিক্ষোভ মিছিলের আয়োজন করে। মিছিল সুবোধ মল্লিক স্কোয়ার থেকে বেরিয়ে রানি রাসমণি রোডে শেষ হয় এবং সেখানে ধিক্কার ধ্বনির মধ্য দিয়ে পুলিশমন্ত্রীর কুশপুত্তলিকা দাহ করা হয়। সংক্ষিপ্ত সভায় বক্তব্য রাখেন কমরেডস্ মেনকা বসু রায়, অনিতা মুখার্জী ও প্রণতি কর।

বালুরঘাট নিষ্প্রদীপ

একের পাতার পর

সকলে এবং সিপিএম সরকারের তীব্র সমালোচনা করতে থাকেন।

১৫ ডিসেম্বর বালুরঘাটে এক সাংবাদিক সম্মেলনে দলের জেলা সম্পাদক কমরেড সাগর মোদক গণতান্ত্রিক আন্দোলনে পুলিশী বর্বরতার তীব্র নিন্দা করেন এবং দোষী পুলিশদের গ্রেপ্তার ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবিতে জেলা জুড়ে আন্দোলনের কর্মসূচি ঘোষণা করেন। জেলায় নিষ্প্রদীপ আন্দোলন, জেলা শাসকের নিকট বিক্ষোভ ডেপুটেশন, নাগরিক কনভেনশন প্রভৃতি আন্দোলনের কথা তিনি ঘোষণা করেন।

সিঙ্গুরে জমি অধিগ্রহণ এবং পুলিশি বর্বরতার প্রতিবাদে জেলায় জেলায় অবরোধ

পুরুলিয়া

১২ ডিসেম্বর এস ইউ সি আই দলের পুরুলিয়া জেলা কমিটির উদ্যোগে সহস্রাধিক মানুষ জেলাশাসক দপ্তর ও তার সংলগ্ন শহরের ব্যস্ততম রাস্তা অবরোধ করে। দাবি ওঠে পুরুলিয়া, বাঁকুড়ার অকৃষি জমিতে শিল্প কর। প্রায় চার ঘণ্টা অবরোধ চলে। অবরোধে বক্তব্য রখেন কমরেডস্ প্রণতি ভট্টাচার্য, ডি কে মুখার্জী, কুশধ্বজ মণ্ডল প্রমুখ।

পুলিশ নৃশংস লাঠিচার্জ করে মহিলাদের কাপড় খুলে টেনে হেঁচড়ে দোতলা থেকে নীচে নামিয়ে গ্রেপ্তার করতে থাকে। অন্যদের যথেচ্ছভাবে মারতে মারতে দোতলা থেকে নীচে নামায়, গ্রেপ্তার করে গাড়ীর মধ্যে ছুঁড়ে ছুঁড়ে ফেলতে থাকে। পুলিশের এই পাশবিক আচরণে সমবেত জনতা বিক্ষোভে ফেটে পড়ে। এই পুলিশি বর্বরতা ও বালুরঘাটে দলের নেতা- কর্মীদের উপর পুলিশি অত্যাচারের বিরুদ্ধে দলের জেলা কমিটির ডাকে ১৬ ডিসেম্বর জেলা জুড়ে প্রতিবাদ দিবস পালন করা হয়।

১২ ডিসেম্বর পুরুলিয়া জেলাশাসকের দপ্তরের সামনে প্রতিবাদ

মুর্শিদাবাদ

১৫ ডিসেম্বর খাগড়া চৌরাস্তার সমাবেশে ''রক্তে ভেজা সিঙ্গুর ডাকে আয়রে চলে আয়...'' সঙ্গীত পরিবেশনের পর জেলা সম্পাদক কমরেড স্বপন ঘোষালের নেতৃত্বে পাঁচ শতাধিক মানুষের স্লোগান মুখরিত দৃপ্ত সুসজ্জিত মিছিল কালেক্টরেট অফিসের দিকে এগিয়ে গেলে বিশাল পুলিশ বাহিনী মিছিলের গতিরোধ করে। বিক্ষোভ সভায় বক্তব্য রাখেন জেলা সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেডস্ অপূর্ব ব্যানার্জী ও কুণাল বিশ্বাস।

বহরমপুর কালেকটরেট অফিসের সামনে বিক্ষোভ

বীরভূম

সিঙ্গুরে পুলিশি অত্যাচারের বিচারবিভাগীয় তদন্ত, আহতদের ক্ষতিপূরণ ও সমস্ত মিথ্যা মামলা প্রত্যাহার, সিঙ্গুরে পুলিশ ও ১৪৪ ধারা তুলে নেওয়া, কৃষকের জমি কৃষককে ফিরিয়ে দেওয়া ইত্যাদি দাবি ও বালুরঘাটে এস ইউ সি আই নেতা-কর্মীদের উপর পুলিশের নৃশংস লাঠিচার্জের প্রতিবাদে ১৫ ডিসেম্বর জেলাশাসকের দপ্তর অবরোধ করা হয়।

বাঁকুড়া

এস ইউ সি আই বাঁকুড়া জেলা কমিটির উদ্যোগে ১২ ডিসেম্বর জেলাশাসকের দপ্তরের সামনে বিক্ষোভ দেখানো হয়। বেলা ১২টা নাগাদ বাঁকুড়া বঙ্গবিদ্যালয় মাঠ থেকে চাষী-মজুর-ছাত্র-যুবক-মহিলাদের একটি সুসজ্জিত মিছিল শহর পরিক্রমা করে। মিছিলটি জেলাশাসকের দপ্তরে এলে পুলিশ মিছিলের গতিরোধ করার চেষ্টা করে। প্রধান ফটকের কাছে বিক্ষোভকারীদের সাথে পুলিশের ধস্তাধস্তি হয়, পুলিশ লাঠিচার্জ করে। অবরোধে নেতৃত্ব দেন দলের জেলা সম্পাদক কমরেড জয়দেব পাল।

৬ জনের এক প্রতিনিধি দল জেলাশাসকের সাথে দেখা করে এক স্মারকলিপিতে দাবি জানান — (১) কৃষিজমিতে শিল্প নয়, অকৃষিজমিতে শিল্পস্থাপন করতে হবে; (২) সিঙ্গুর থেকে অবিলম্বে ১৪৪ ধারা এবং সমস্ত পুলিশ প্রত্যাহার করতে হবে; (৩) বড়জোড়ায় তিন-চার ফসলি জমি দখল করে খোলামুখ কয়লাখনি তৈরি করার বিপজ্জনক পরিকল্পনা বাতিল করতে হবে।

মেদিনীপুর

১৫ ডিসেম্বর মেদিনীপুর শহরের স্টেশন থেকে সহস্রাধিক মানুষ মিছিল করে বিদ্যাসাগর মূর্তির পাদদেশে জমায়েত হয়। এই সমাবেশে বক্তব্য রাখেন, জেলা কমিটির সদস্য কমরেড অমল মাইতি ও কমরেড পঞ্চানন প্রধান। বক্তারা বলেন, এ জেলাতেও জমি দখল চলছে। খড়্গপুরের জফলাতে কৃষিজমি এবং আদিবাসীপল্লী দখলের নোটিস দেওয়া হয়েছে। শালবনীতে আদিবাসী গ্রাম দখলের ঘোষণা করা হয়েছে। এর প্রতিবাদে আন্দোলনের অঙ্গ এই আইনঅমান্য।

সশস্ত্র পুলিশবাহিনী মিছিলের গতিরোধ করে। আইন-অমান্যকারীদের সঙ্গে পুলিশের প্রবল ধাক্কাধাক্কি হয়। পুলিশ এস ইউ সি আই কর্মীদের উপর লাথি, ঘুঁসি ও লাঠি চালায়।

১২ ডিসেম্বর বাঁকুড়ায় ডি এম দপ্তরের সামনে বিক্ষোভ

১৫ ডিসেম্বর পশ্চিম মেদিনীপুর জেলাশাসকের দপ্তরের সামনে আইন অমান্য

ভগবানগোলায় কৃষি-বিদ্যুৎ গ্রাহকদের বিক্ষোভ

মাঠে মাঠে বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন করার ও ট্রান্সফরমার নামিয়ে নেওয়ার প্রতিবাদে এবং মাশুল কমানোর দাবিতে গত ৬ ডিসেম্বর অ্যাবেকার পক্ষ থেকে ভগবানগোলা গ্রুপ ইলেকট্রিক সাপ্লাই অফিসের স্টেশন ম্যানেজারকে ডেপুটেশন দেওয়া হয়েছে। তার আগে দুই শতাধিক কৃষিবিদ্যুৎ গ্রাহকদের এক বিক্ষোভ মিছিল এলাকা পরিক্রমা করে। এস এস দপ্তরের সামনে সমাবেশে বক্তব্য রাখেন জেলা সম্পাদক কুণাল বিশ্বাস, রাজ্য কমিটির সদস্য মইনুদ্দিন সরকার, শাখা সম্পাদক জহরলাল পান ও আব্দুর রউফ প্রমুখ। সভার শুরুতে উপস্থিত সকল বিদ্যুৎ গ্রাহকদের অভিনন্দন জানিয়ে বক্তব্য রাখেন সমিতির সভাপতি নিখিলকৃষ্ণ কবিরাজ ঠাকুর। পাশের গ্রুপ ইলেকট্রিক সাপ্লাই লালগোলা শাখা সম্পাদক নজরুল ইসলাম সহ বেশ কিছু প্রতিনিধি কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করেন।

খড়্গপুরে কৃষিজমি রক্ষার দাবিতে মিছিল

২৫ নভেম্বর খড়্গপুর কৃষিজমি বাঁচাও কমিটির পতাকাতলে প্রায় অর্দ্ধসহস্র মানুষের দৃপ্ত মিছিল জফলা-বড়াডিহার দীর্ঘপথ পরিক্রমা করে। মহিলা এবং বয়স্ক কৃষকদের অংশগ্রহণ ছিল চোখে পড়ার মতো। এদের কেউ কেউ আবার শিশু কোলেও এসেছেন। মিছিল থেকে স্লোগান উঠেছে, 'জান থাকতে জমি নয়'। সমস্বরে ধ্বনিত হয়েছে, 'উর্বর কৃষিজমি বাদ দিয়ে অনাবাদি জমিতে শিল্পস্থাপন করতে হবে।' কমিটির সভাপতি গৌরহরি ঘোষ এবং সম্পাদক বিবেকানন্দ সাহু মিছিলে অংশগ্রহণকারী সবাইকেই এই আন্দোলনে কৃষক ও খেতমজুর সহ সমস্ত অংশের মানুষকে যুক্ত করে আন্দোলনকে শক্ত ভিতের উপর দাঁড় করানোর আহ্বান জানিয়েছেন।

কমরেড স্বপন রায়চৌধুরী বিপ্লবী সংস্কৃতি অর্জনের সংগ্রামে লিপ্ত ছিলেন

স্মরণসভায় নেতৃবৃন্দের শ্রদ্ধার্ঘ

এস ইউ সি আই-এর নেতৃস্থানীয় বিশিষ্ট সংগঠক কমরেড স্বপন রায়চৌধুরী (৬৭) দীর্ঘ রোগভোগের পর গত ৩০ নভেম্বর দমদমের বাড়িতে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তাঁর মৃত্যুসংবাদ পৌঁছতেই এস ইউ সি আই এবং ইউ টি ইউ সি-লেনিন সরণীর রাজ্য অফিসে রক্তপতাকা অর্ধনমিত করা হয়।

২ ডিসেম্বর কমরেড স্বপন রায়চৌধুরীর মরদেহ প্রথমে ইউ টি ইউ সি-লেনিন সরণীর অফিসের সামনে আনা হয়। সেখানে সংগঠনের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক কমরেড শংকর সাহা, অন্যতম সম্পাদক কমরেড সুনীল মুখার্জী, রাজ্য সম্পাদক কমরেড দিলীপ ভট্টাচার্য সহ রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর অন্যান্য সদস্যরা মাল্যদান করে শ্রদ্ধা জানান। প্রয়াত কমরেড স্বপন রায়চৌধুরীর বড়দা ও অন্যান্য আত্মীয়স্বজনও সেখানে মাল্যদান করেন। বহু কলকারখানা থেকে শ্রমিকরা, ইউ টি ইউ সি-লেনিন সরণীর বিভিন্ন ইউনিট থেকেও মাল্যদান করা হয়। এরপর মরদেহ এস ইউ সি আই অফিসের সামনে নিয়ে যাওয়া হয়। 'কমরেড স্বপন রায়চৌধুরী লাল সেলাম' ধ্বনির মধ্যে মাল্যদান করে শ্রদ্ধা জানান কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য কমরেড অনিল সেন, কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষ, রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড রণজিৎ ধর। পুরুলিয়া থেকে ছুটে এসেছিলেন পার্টির জেলা সম্পাদক কমরেড নির্মল মণ্ডল, জেলা সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড প্রণতি ভট্টাচার্য, শ্রমিক সংগঠক কমরেড সি পি ঠাকুর। তাঁরাও মাল্যদান করেন। রাজ্য অফিস সম্পাদক কমরেড স্বপন ঘোষ ছাড়াও অফিসের কমরেডদের পক্ষে শ্রদ্ধা জানান কমরেড বিপুল রায়। পার্টি ও গণসংগঠনগুলির বিভিন্ন ইউনিট থেকেও মাল্যদান করা হয়।

১১ ডিসেম্বর ইউ টি ইউ সি-লেনিন সরণীর পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির আহ্বানে কলকাতার ভারতসভা হলে স্মরণসভা অনুষ্ঠিত হয়। মঞ্চে স্থাপিত কমরেড স্বপন রায়চৌধুরীর ছবিতে মাল্যদান করা হয়।

সভাপতির ভাষণে কমরেড রণজিৎ ধর বলেন, অকালমৃত্যু সবসময়ই দুঃখের। কিন্তু বিপ্লবী আন্দোলনের একটি স্ফুলিঙ্গ যখন নিভে যায়, তখন সেটা গোটা সমাজের ক্ষতি — যা পূরণ হওয়ার নয়।

কমরেড স্বপন বয়সে আমার থেকে অনেক ছোট ছিল। আজ তাঁর স্মরণসভায় আমায় বলতে হচ্ছে, এটা অত্যন্ত দুঃখের ও শোকের। স্বপন ছাত্র অবস্থায় ছাত্র আন্দোলনের সঙ্গে, ডি এস ও'র সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল এবং এই সূত্র ধরেই বিপ্লবী রাজনীতির অঙ্গনে তাঁর প্রবেশ। স্বপনের সাথে আমার ঘনিষ্ঠতা গড়ে ওঠে পুরুলিয়ায় পার্টির কাজের সূত্রে। যারাই তাঁর সান্নিধ্যে এসেছেন, তাঁরাই জানেন, সাধারণ মানুষের সঙ্গে তাঁর কী অন্তরঙ্গ সম্পর্ক ছিল। সে মানুষের মধ্যেই থাকত, নেতা হিসাবে তাঁকে আলাদা করা যেত না। স্বপনের ছিল গভীর সংবেদনশীল মন। শোষিত মানুষের প্রতি তাঁর দায়বদ্ধতা ছিল অত্যন্ত গভীর।

স্বপন অত্যন্ত সাবলীলভাবে পার্টিকে মানুষের মধ্যে নিয়ে যেতে পারত। মানুষের সাথে তাঁর মেলামেশার ধরন, তাদের সুখ-দুঃখের সাথে একাত্ম হয়ে যাওয়া — এর মধ্য দিয়েই সে রাজনীতি নিয়ে গেছে মানুষের ভেতরে এবং বহু মানুষকে সে আকৃষ্ট করেছে। গ্রামীণ জীবনে বা শ্রমিক অধ্যুষিত অঞ্চলে, সর্বত্রই সে সকলের আপনজন ছিল। প্রত্যেকের ঘরে ঘরে সে অনায়াসে চলে যেতে পারত। এভাবে মেলামেশার মধ্য দিয়েই স্বপন কিন্তু পার্টির রাজনীতির মূল সুরটা পৌঁছে দিতে পারত। এই গুণ খুব বিরল।

সমাজের সকলে তো বিপ্লবী আন্দোলনে আসে না, সামাজিক আন্দোলনেও আসে না। তারাই আসে যাদের ভিতরে ব্যক্তির প্রয়োজনের বাইরে অপরের প্রয়োজনে কোন কিছু করার একটা আবেগ ও মানসিকতা থাকে। এ একটা মূল্যবোধ, যা ব্যক্তিমনকে নিজস্ব প্রয়োজনের বাইরে অপরের সুবিধা-অসুবিধায় আবেগতাড়িত করে। এই মূল্যবোধই একজন মানুষকে রাজনীতিতে নিয়ে আসে। এই মূল্যবোধই স্বপনকে প্রথমে ছাত্র রাজনীতিতে নিয়ে আসে এবং পরে সংগ্রামের পথে সে পার্টির একজন সংগঠকে পরিণত হয়।

প্রতিটি পার্টিরই একটা আভ্যন্তরীণ জীবন থাকে। মূল রাজনীতির ভিত্তিতে জীবনের একটা লক্ষ্য থাকে, একটা মূল্যবোধ থাকে। পরস্পর পরস্পরের সাথে আচরণের, জনতার সঙ্গে মিশবার একটা ধরন থাকে। নেতা-নেতা, নেতা-কর্মী, কর্মী-কর্মী সম্পর্ক থাকে। এই আভ্যন্তরীণ জীবনটাই কিন্তু তার সংস্কৃতিকে নতুন করে গড়ে দেয়। মানুষ একটা সংস্কৃতি নিয়েই রাজনীতিতে আসে। প্রচলিত সমাজের প্রভাবেই একজনের মধ্যে ভালমন্দ বোধ, পছন্দ-অপছন্দ, চাওয়া-পাওয়ার প্রকৃতি গড়ে ওঠে। কিন্তু একটা রাজনীতির সম্পর্কে আসার পর সেই বিশেষ রাজনীতিকে কেন্দ্র করে একটা সংস্কৃতির মধ্যে সে আবর্তিত হয়। সেটাই তার ব্যক্তিগত জীবনের চাওয়া-পাওয়াকেও প্যাটার্ন করে দেয়। এই সংস্কৃতির সুরটাই কমরেড শিবদাস ঘোষ শুরু থেকেই দলের মধ্যে উচ্চ তারে বেঁধে দিয়েছিলেন। তিনি বারবারই বলতেন, সমস্ত আদর্শেরই মর্মবস্তু নিহিত আছে তার সংস্কৃতির মধ্যে। বাকিটা হচ্ছে তার কাঠামো। সর্বহারা বিপ্লবী রাজনীতিরও মূল মর্মবস্তু হচ্ছে তার সংস্কৃতি। এই সংস্কৃতিকে যে যত ভালভাবে আয়ত্ত করতে পারে, সে-ই বিপ্লবী রাজনীতির সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম দিকগুলোও উপলব্ধি করতে পারে, কঠিন বিষয়গুলোকে সে সহজেই আয়ত্ত করতে পারে। তখন তার জীবন পাল্টে যায়, চরিত্র পাল্টে যায়। কমরেড শিবদাস ঘোষ গোড়া থেকেই এই সংস্কৃতিটা পার্টির মধ্যে গড়ে দিয়েছেন। এটা সহজে গড়ে ওঠেনি, এর পিছনে কমরেড শিবদাস ঘোষের নিরলস সংগ্রাম আছে। এই যে সাধারণ মানুষ, যাঁরা পার্টির রাজনীতিটা ভাল করে জানেনও না, তাঁরাও যে আমাদের কর্মীদের আলাদা চোখে দেখেন, সেটাও ঐ সংস্কৃতির জন্যই। একজন কর্মী রাজনীতির কথা কত ভালভাবে বলতে পারছে, তার চেয়েও বড় কথা হচ্ছে, তার জীবন, চরিত্র, ব্যবহার কেমন। এই সংস্কৃতি আমাদের সকলের মধ্যে এক জায়গায় নেই, আমরা সকলেই তা আয়ত্ত করার সংগ্রামে আছি। কেউ এগিয়ে আছি, কেউ পিছিয়ে আছি। যে পিছিয়ে আছে, তার মধ্যেও এগিয়ে যাওয়ার একটা সংগ্রাম আছে। এই সর্বহারা সংস্কৃতির মূল কথাটা হ'ল, বিপ্লবের প্রয়োজনকেই মুখ্য করে ব্যক্তির প্রয়োজনকে গৌণ করা এবং এই সংগ্রামের ধারা বেয়ে বিপ্লবের সাথে নিজেকে সম্পূর্ণ একাত্ম করে দেওয়া। কমরেড স্বপন রায়চৌধুরী সচেতনভাবে এই সংগ্রামে নিজেকে যুক্ত করে এগোচ্ছিল। কিন্তু শেষজীবনে অসুস্থতার কারণে সে কর্মক্ষম থাকতে পারেনি। এ সমাজে প্রতিষ্ঠা পাওয়া বলতে যা বোঝায়, নাম, পদ, যশ ইত্যাদি সবকিছুই বিপ্লবের আবেদনের কাছে তাঁর জীবনে তুচ্ছ হয়ে গিয়েছিল।

আমরা যখন স্মরণসভায় কাউকে শ্রদ্ধা জানাই, তার একটাই উদ্দেশ্য থাকে, সেটা হচ্ছে তাঁর জীবন থেকে শিক্ষা নেওয়া। কমরেড স্বপন রায়চৌধুরী তাঁর সমগ্র জীবন দিয়ে দেখিয়েছে যে, বিপ্লবী জীবনই একমাত্র মর্যাদাময় জীবন, এর বাইরে পাওয়ার কিছু নেই। আমরা যারা এই সংগ্রামে পিছিয়ে আছি, তারা যদি কমরেড স্বপনের জীবন থেকে এই শিক্ষা নিতে পারি, তবেই তাঁকে শ্রদ্ধা জানানোর সার্থকতা।

কমরেড প্রভাস ঘোষ বলেন, আমরা সকলেই কমরেড শিবদাস ঘোষের চিন্তাধারায় অনুপ্রাণিত বিপ্লবী আন্দোলনের সৈনিক। আমাদের মূল্যায়ন একটাই, সেটা হচ্ছে, যে যে দায়িত্বেই থাকি না কেন, আমরা বিপ্লবী সংগ্রামে মহান মার্কসবাদী চিন্তানায়ক কমরেড শিবদাস ঘোষের শিক্ষানুযায়ী কীভাবে আমাদের চরিত্র গড়ে তুলতে পারছি, কীভাবে আমরা আন্দোলনের দায়িত্ব পালন করতে পারছি। এই সংগ্রামে আমরা প্রত্যেকে প্রত্যেকের থেকে শিক্ষা নিই। স্মরণসভার আয়োজন সেই উদ্দেশ্যেই।

কমরেড স্বপন রায়চৌধুরীকে পুরনো কমরেডরা জানেন; যাঁরা ছয়ের দশকে, সাতের দশকে পার্টির সাথে যুক্ত হয়েছিলেন তখন থেকে তাঁরা জানেন। আবার '৮২ সাল থেকে '৮৯ সাল পর্যন্ত অসুস্থতা সত্ত্বেও সে কিছুটা কাজ করতে পেরেছিল। এইসময়ও কিছু কমরেড তাকে দেখেছেন। তাঁর সম্পর্কে পুরনো কমরেডদের স্মৃতিকে জাগ্রত করা, আর নতুনদের পরিচয় করানোর প্রয়োজন আছে।

কমরেড স্বপন আমাদের সাথে যুক্ত হয় ১৯৫৬ সালে। তাঁর কাকা কমরেড মাধব রায়চৌধুরী আশুতোষ কলেজে আমার সাথে তাঁর যোগাযোগ করিয়ে দিয়েছিলেন। সেই বছরই আমরা প্রথম আশুতোষ কলেজে ইউনিয়ন জয় করতে চলেছি। কমরেড স্বপনের মধ্যে তখন একদিকে বিবেকানন্দের ও নেতাজীর প্রভাব প্রবল ছিল, অন্যদিকে অবিভক্ত সিপিআই-র ছাত্র সংগঠন এ আই এস এফেরও প্রভাব ছিল। এই অবস্থায় আমাদের পার্টির বক্তব্য শুনে, কমরেড শিবদাস ঘোষের চিন্তাধারার সংস্পর্শে এসে ধীরে ধীরে সে পার্টির সাথে যুক্ত হয়। যখন পার্টিকে নানা দিক থেকে জেনেবুঝে সে যুক্ত হওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়, তখন ঐ বয়সেই পার্টির আদর্শকে সে পারিবারিক জীবনেও নিয়ে যায়। পরিবারে যাঁরা বড় ও ছোট, ভাইবোন সকলকেই সে পার্টির সাথে যুক্ত করার চেষ্টা করে। এটা যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ সংগ্রাম ছিল।

তখনকার সময়টা কী ছিল, এখনকার কর্মীদের পক্ষে তা বোঝা কঠিন। এস ইউ সি আই তখন প্রায় অপরিচিত। আমাদের মহান শিক্ষক কমরেড শিবদাস ঘোষের নামও তেমন পরিচিত ছিল না। অবিভক্ত সিপিআই তখন বিরাট প্রভাব নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। সোভিয়েত পার্টির সমর্থন, চীনের পার্টির সমর্থন নিয়ে তারাই তখন দেশে কমিউনিস্ট নামে পরিচিত। তারাই তখন গণআন্দোলনের নেতৃত্বে প্রধান শক্তি, তাদের অধিকাংশ নেতা-কর্মী জনসাধারণের মধ্যে সৎ ও সংগ্রামী বলে পরিচিত। এই পরিবেশের মধ্যে একেকটি ছাত্রকে ডি এস ও-র সাথে যুক্ত করা, একেকটি মানুষকে এস ইউ সি আই-এর সাথে যুক্ত করা ছিল অত্যন্ত কঠিন। ঐ সময়েই ডি এস ও-র কাজ মূলত দক্ষিণ কলকাতায় শুরু হয়। বহু রকম কাজকর্ম তখন আমাদের করতে হত — ফ্রি কোচিং ক্লাস, কালচারাল-সোসাল অনুষ্ঠান, কলেজে কলেজে আন্দোলন চালানো। এইসব নানাকিছুর মধ্যে দিয়ে ছাত্রছাত্রীদের সাথে সংযোগ স্থাপন করা, এ আই এস এফের প্রভাব মুক্ত করে আমাদের দিকে আকর্ষণ করা কঠিন কাজ ছিল। এখনকার ডি এস ও কর্মীদের পক্ষে সেদিনকার পরিস্থিতি বোঝাও মুশকিল। এখন এস ইউ সি আই-এর সংগঠন বললে ছাত্র-শিক্ষক-অভিভাবকদের অনেকের মধ্যে একটা প্রবল আকর্ষণ তৈরি হয়। 'কমরেড শিবদাস ঘোষের ছাত্র' এই কথাটাই এখন প্রবল আকর্ষণ ও মর্যাদার সৃষ্টি করে। তখন কিন্তু সম্পূর্ণ বিপরীত পরিস্থিতি ছিল।

আমার সারাদিন তখন আশুতোষ কলেজেই কাটত। সচ্ছল পরিবারের ছেলে হয়েও স্বপন আমাদের সঙ্গে দিন নেই, রাত নেই, খাওয়া নেই, কাজের মধ্যেই লিপ্ত থাকত। দক্ষিণ কলকাতায় ডি এস ও'র শক্তিশালী সংগঠন গড়ে ওঠার ক্ষেত্রে তাঁর ভূমিকা ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। পরে ও যখন ছাত্র ইউনিয়নের জেনারেল সেক্রেটারি হয়, তখন একটা গুরুত্বপূর্ণ আন্দোলন ঐ কলেজে দুর্নীতির বিরুদ্ধে হয়েছিল। আন্দোলনে আমরা জয়যুক্ত হই। কিন্তু ষড়যন্ত্র করে কলেজ বন্ধ করে দিয়ে কর্তৃপক্ষ সংবাদপত্রের মাধ্যমে মিথ্যা প্রচার করে দেয় যে, প্রিন্সিপাল আমাদের দ্বারা নিগৃহীত হয়েছেন। এই অভিযোগে আমাদের ৭ জন সংগঠককে কলেজ থেকে বহিষ্কার করা হয়। তাদের মধ্যে কমরেড স্বপন রায়চৌধুরী ছিল। বাকি সলিল চক্রবর্তী, সঞ্জিত বিশ্বাস, ফণি গুছাইত এই তিনজন এখনও সক্রিয়ভাবে পার্টির সঙ্গে আছে। সেসময় কমরেড শিবদাস ঘোষ আমাকে একটা মূল্যবান শিক্ষা দিয়েছিলেন যে, ওরা যে সংগঠন ভাঙতে চাইছে, সেটাকে সংগঠন বৃদ্ধির কাজে লাগাও। ওদের অন্যত্র ছড়িয়ে দাও। নানা জায়গায় গিয়ে এরা সংগঠন করুক। এই কলেজে আবার নতুন এক দলকে তৈরি করতে হবে। অর্থাৎ অসুবিধাকে সুবিধায় পরিণত কর। এই কাজটা করে আমরা যথেষ্ট সাফল্য পাই। কলেজ ইউনিয়নটাও আমরা পুনরায় ফিরে পাই, নতুন জায়গাতেও সংগঠন গড়ে ওঠে।

কমরেড স্বপন তার ভিত্তিতে দমদমে যায় এবং সেখানেও পার্টির সংগঠন গড়ে তোলার ক্ষেত্রে কমরেড কৃষ্ণ চক্রবর্তীর সাথে সে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেয়। ছয়ের দশকে কলকাতায় যে ক'টা শক্তিশালী ইউনিট কাজ করত, দমদম তার অন্যতম ছিল। পার্টি এবং ডি এস ও গড়ে তোলার ক্ষেত্রে দমদমে স্বপন যথেষ্ট সাংগঠনিক ক্ষমতার পরিচয় দিয়েছিল। কমরেড শঙ্কর সাহা এখানে বলে গেছে, কিভাবে স্বপন তাকে দলে যুক্ত করেছে। কমরেড শঙ্কর সাহা সহ আরও কিছু কমরেডকে সে সেই সময় পার্টির সাথে যুক্ত করেছিল। ওর একটা অদ্ভুত ক্ষমতা ছিল, অল্প কথায় মানুষকে আকর্ষণ করতে পারত। গভীর স্নেহ-ভালবাসার জোরে ও অপরকে কাছে টানত, গভীর স্নেহ ভালোবাসার মধ্য দিয়েই ও কমরেড শিবদাস ঘোষের শিক্ষার মূল সুরটা পৌঁছে দিতে পারত। এই সংস্কৃতি পড়ে পাওয়া যায় না। কোটেশন মুখস্থ করে পাওয়া যায় না। এ হচ্ছে অনেকটা ধ্যানমগ্ন হয়ে অন্তরের গভীরে মূল্যবোধের প্রদীপকে জ্বালিয়ে রাখা — যা অন্যায়, যা মিথ্যা, যা কুৎসিত তার থেকে নিজেকে মুক্ত রাখার এক বিরামহীন সংগ্রাম। এই সংগ্রাম

ছয়ের পাতায় দেখুন

মহান নভেম্বর বিপ্লবের হাতিয়ার ‘সোভিয়েত’ প্রতিষ্ঠার শতবর্ষে

(৪)

১৯১২ সালে প্রাগ-এ পার্টির কনফারেন্সে মেনশেভিক ও আপসকামীদের বিপরীতে লেনিনের নেতৃত্বে বলশেভিকরা একটি স্বতন্ত্র পার্টি হিসাবে আবির্ভূত হয়। এই ঘটনা পরবর্তীকালে পার্টি ও বিপ্লবের উপর সুদূরপ্রসারী প্রভাব সৃষ্টি করে। এক মানুষের মতো দাঁড়িয়ে বলশেভিকরা পাঁচ বছর বাদেই বিপ্লব সফল করে।

‘সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধকে গৃহযুদ্ধে রূপান্তরিত কর’ — লেনিন

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়ে যায় ১৯১৪ সালে। অন্য দেশের প্রাকৃতিক সম্পদ, সস্তা শ্রম ও বাজার দখলের লালসায় সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলি ঝাঁপিয়ে পড়ে ও পরস্পর কামড়াকামড়ি করতে থাকে। রাশিয়ার জারও সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধে যোগ দেয় এবং সমস্ত রুশ নাগরিককে যুদ্ধে যোগদানের ফতোয়া জারি করে। রাশিয়ার বুর্জোয়াশ্রেণী আশা করেছিল যে, জারের স্বৈরতন্ত্রকে বর্ম হিসাবে ব্যবহার করে নিশ্চয় নতুন নতুন দেশের বাজার দখল করা যাবে এবং দেশের অভ্যন্তরে শ্রমিক ও কৃষকদের বিপ্লবী আন্দোলনকে চূর্ণ করা যাবে। যুদ্ধের শুরু থেকেই সোস্যালিস্ট রেভোলিউশনারি ও মেনশেভিক — এই দলগুলি লালঝাণ্ডা উড়িয়ে যুদ্ধের পক্ষে প্রচার করতে থাকে এবং জনসাধারণকে বোঝাতে থাকে যে, বর্বর জার্মানদের কবল থেকে পিতৃভূমি রক্ষার এই লড়াইয়ের সময় দেশের মধ্যে বিক্ষোভ-আন্দোলন করে অশান্তি সৃষ্টি করা চলবে না, যে কোন মূল্যে শান্তি বজায় রাখতে হবে। একমাত্র বলশেভিক পার্টি লেনিনের শিক্ষায় ও নির্দেশে জনসাধারণের সামনে সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের লুটেরা চরিত্র উদ্‌ঘাটিত করে দেখায় এবং এই সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের বিরুদ্ধে শ্রমিকশ্রেণীকে দৃঢ়সঙ্কল্প নিয়ে সংগ্রামের আহ্বান জানায়। তারা স্লোগান তোলে, ‘সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধকে গৃহযুদ্ধে রূপান্তরিত কর’। শ্রমিকশ্রেণীও দাঁড়ায় বলশেভিকদের পাশে।

রাশিয়ার বুর্জোয়ারা ও জমিদাররা যুদ্ধ থেকে বিপুল অর্থ কামাতে লাগল। কিন্তু বিশ্বযুদ্ধের গ্রাসে লক্ষ লক্ষ মানুষ নিহত ও আহত হ'ল, শ্রমিক-কৃষক-সৈনিকরা চরম দুঃখ কষ্ট ও দারিদ্র্যের শিকার হ'ল। প্রায় ১ কোটি ৪০ লক্ষ যুবককে জবরদস্তি সেনাবাহিনীতে ঢোকানো হল। এদিকে তখন কাঁচামালের অভাবে কল-কারখানা বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। খেতমজুরের অভাবে চাষের জমি পড়ে থাকছে। জনসাধারণ, এমনকী যুদ্ধক্ষেত্রের সৈনিকরাও খাদ্য-জামা-কাপড়-জুতোর অভাবে ভুগছে। বেকার সমস্যা তীব্রতর। শ্রমিকদের অবস্থা অসহনীয়। রণাঙ্গণে রাশিয়া বারবার পরাস্ত হচ্ছে। পাশাপাশি, বলশেভিকদের ক্রমাগত প্রচারের ফলে মানুষ বুঝতে লাগল, এই অসহনীয় অবস্থা থেকে মুক্তির একমাত্র পথ জার স্বৈরতন্ত্রের উচ্ছেদ। সকল দমনপীড়ন উপেক্ষা করে ১৯১৭-র জানুয়ারি থেকে আবার শুরু হয়ে গেল দেশজুড়ে ধর্মঘট ও বিক্ষোভের প্লাবন। মস্কো, পেত্রোগ্রাদ সর্বত্র। শ্রমিকশ্রেণী স্লোগান দিল — জার নিপাত যাক, যুদ্ধ নিপাত যাক, আমরা চাই রুটি। পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষ চলল। শ্রমিকরা পুলিশ ও সিপাইদের অস্ত্র কেড়ে নিতে লাগল।

ইতিমধ্যে শ্রমজীবী জনগণের পাশাপাশি সেনা ও নৌবাহিনীর মধ্যেও বলশেভিকরা প্রচারাভিযান চালায়। সেনা ও নৌবাহিনীতে, খাস রণক্ষেত্রে ও তার পশ্চাদ্‌ভাগে বলশেভিকরা, ছোট ছোট দল গঠন করে এবং যুদ্ধের বিরুদ্ধে সংগ্রামের আহ্বান জানিয়ে ইস্তাহার বিলি করে।

ফলে সৈনিকরাও শ্রমিকদের পক্ষে চলে যায়। তারা শ্রমিক বিক্ষোভে গুলি চালাতে অস্বীকার করে, আবার কোথাও বা তারা জারপন্থী পুলিশের উপর গুলি চালায়। বিদ্রোহী শ্রমিক ও সৈনিকরা জারের মন্ত্রী ও সেনাপতিদের গ্রেপ্তার করে, বিপ্লবীদের জেল থেকে মুক্ত করে দেয়। এইভাবে জার স্বৈরতন্ত্রের পরাজয় নিশ্চিত হয়ে যায়। এই সংবাদ অন্যান্য শহরে ও রণক্ষেত্রে ছড়িয়ে পড়ে। সর্বত্র শ্রমিক ও সৈনিকরা জারের কর্মচারীদের পদচ্যুত করতে থাকে। অবশেষে স্বৈরাচারী জারতন্ত্রের উচ্ছেদ ঘটে।

জারতন্ত্রের পতনের পর সোস্যালিস্ট রেভোলিউশনারি এবং মেনশেভিক দলের সমর্থনে রাশিয়ার ক্ষমতা দখল করে অস্থায়ী বুর্জোয়া সরকার। এই বিপ্লবের আগে জার যাঁকে তার প্রধানমন্ত্রী করতে চেয়েছিল সেই প্রিন্স ল্‌ভোভ হলেন নয়া বুর্জোয়া সরকারের প্রধান।

দ্রুত আরও মজবুত হয়ে সোভিয়েতগুলি গড়ে উঠতে লাগল

এই বিপ্লব শুরু হবার সঙ্গে সঙ্গে আবার গড়ে উঠতে লাগল শ্রমিক ও সৈনিক প্রতিনিধিদের সোভিয়েত। ছোট গ্রামের সোভিয়েতগুলোতে আবার উচ্চারিত হ'ল কৃষকদের সম্মিলিত পুরনো কণ্ঠস্বর, ‘জমি ভগবানের ও জনগণের’। শহরের শ্রমিকরা দাবি তুলল, ‘কলকারখানা শ্রমিকদের’। রণক্ষেত্রে সৈনিকেরা ঘোষণা করল, ‘এ যুদ্ধ শয়তানের। আমরা যুদ্ধ চাই না, শান্তি চাই।’ ১৯০৫-এর বিপ্লবের সময়েই দেখা গিয়েছিল, এই সোভিয়েতগুলি হয়ে উঠতে পারে সশস্ত্র বিপ্লবের হাতিয়ার, আবার নতুন বিপ্লবী শক্তির ভ্রূণও। তবে তখন গড়ে উঠেছিল শুধু শ্রমিক-সোভিয়েত, ১৯১৭ সালে গড়ে উঠল শ্রমিক ও সৈনিক সোভিয়েত। কিন্তু এই সোভিয়েতগুলির নেতৃত্ব দখল করে বসে শোধনবাদী মেনশেভিক ও সোস্যালিস্ট রেভোলিউশনারিরা। পেত্রোগ্রাদ, মস্কো সহ বেশ কয়েকটি বড় শহরের সোভিয়েতের কার্যকরী কমিটি এই দুই পার্টির দখলে এসে যায়। বস্তুত এই সময়েই রাশিয়ায় দু'টি ক্ষমতাকেন্দ্র গড়ে ওঠে। একদিকে অস্থায়ী বুর্জোয়া সরকার ও অন্যদিকে সোভিয়েত শক্তি।

অস্থায়ী বুর্জোয়া সরকারের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গি কী হবে

৫ মার্চ পেত্রোগ্রাদে বলশেভিকদের উদ্যোগে সংবাদপত্র ‘প্রাভদা’ নতুন করে প্রকাশিত হতে শুরু করল। এদিকে নতুন বুর্জোয়া সরকারের প্রতি এখন কী দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে চলা হবে — সেই প্রশ্নে লেনিনের অনুপস্থিতিতে বলশেভিক নেতারা সিদ্ধান্ত নিতে দ্বিধা করছিলেন। কয়েকজন বলশেভিক নেতা অস্থায়ী সরকারকে শর্তসাপেক্ষে সমর্থন করার পক্ষপাতী ছিলেন।

৭ মার্চ থেকে লেনিন প্রাভদার ঠিকানায় ‘দূর থেকে লেখা চিঠি’ পাঠাতে শুরু করলেন। মোট ৫টি চিঠিতে তিনি রাশিয়ার ঘটনাবলী বিশ্লেষণ করে বলশেভিক পার্টির করণীয় বিষয় সম্পর্কে বক্তব্য রাখলেন।

লেনিন বলেন — যতদিন সোভিয়েতগুলিতে মেনশেভিক ও সোস্যালিস্ট রেভোলিউশনারিরা, অর্থাৎ বিপ্লববিরোধী শক্তিগুলি, সংখ্যা গরিষ্ঠ থাকবে, ততদিন ধৈর্যের সাথে সমালোচনা করে করে অস্থায়ী সরকারের প্রকৃত চেহারা জনগণের সামনে তুলে ধরতে হবে। লেনিন দেখান — সোভিয়েতগুলিকে বুঝিয়ে, তাদের রাজনৈতিক চেতনাকে আরও উন্নত করে বেশিরভাগ সোভিয়েতের নেতৃত্বে আসতে হবে বলশেভিকদের।

৩(১৬) এপ্রিল সন্ধ্যায় লেনিন দেশছাড়া অন্যান্য বিপ্লবী নেতা-কর্মীদের পুরো দল নিয়ে পৌঁছে গেলেন পেত্রোগ্রাদে। দশ বছর পর রাশিয়ার মাটি ছুঁলেন তিনি। ১৯০৫-এর অভ্যুত্থানের পর দেশ ছেড়েছিলেন, আর এক সফল বিপ্লবের (১৯১৭) পর ফিরে এলেন।

৩ এপ্রিল ছিল ছুটির দিন। পেত্রোগ্রাদে সেদিন কাগজ বন্ধ, কলকারখানা বন্ধ। কিন্তু লেনিনের আসার সংবাদ চাপা থাকেনি। শ্রমিক, সৈনিক, নাবিক ও বিপ্লবী সংগঠনগুলির প্রতিনিধিরা লালঝাণ্ডা উড়িয়ে ফুলের মালা নিয়ে, ব্যান্ড বাজিয়ে স্টেশনে হাজির। লেনিন নামতেই সাড়া পড়ে গেল। চারদিক থেকে হাততালি, অভিনন্দন, ব্যান্ডে আন্তর্জাতিক সঙ্গীতের সুর। শ্রমিক ও সৈনিকরা লেনিনকে তুলে দিল একটা সাঁজোয়া গাড়ির ওপর। সেই গাড়ির ওপর দাঁড়িয়ে লেনিন রাশিয়ার বিপ্লবী সর্বহারাশ্রেণীকে অভিনন্দন জানালেন।

লেনিন এসে বলশেভিক পার্টির হাল ধরলেন

সেদিনই সারারাত ধরে চলে বলশেভিক কর্মীদের সঙ্গে সভা। লেনিন ঘোষণা করেন, ‘এই অস্থায়ী বুর্জোয়া সরকারের প্রতি কোন সমর্থন নয়’। বলশেভিক প্রতিনিধিদের এক সভায় লেনিন তাঁর ঐতিহাসিক রিপোর্ট ‘বর্তমান বিপ্লবে সর্বহারা শ্রেণীর কর্তব্য’ পড়ে শোনান। এই ঐতিহাসিক রিপোর্টটি লেনিনের ‘এপ্রিল থিসিস’-এর অংশ; মার্কসবাদের জ্ঞানভাণ্ডারে এটি একটি অমূল্য সংযোজন। এই থিসিস বলশেভিকদের হাতে তুলে দেয় সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবে উত্তরণের দিক-নির্দেশিকা, বিশ্বসর্বহারা শ্রেণীকে দেয় মার্কসবাদের উন্নততর উপলব্ধি। লেনিন বললেন, সামন্ততন্ত্রের শৃঙ্খল ভেঙে যখন সবেমাত্র পুঁজিবাদ মাথা তুলেছিল, তখন সেই পুঁজিবাদ ছিল বিপ্লবী, প্রগতিশীল। শিল্পের অবাধ বিকাশ ছিল তার লক্ষ্য। আজ সাম্রাজ্যবাদ ও সর্বহারা বিপ্লবের এই যুগে সেই পুঁজিবাদ প্রতিক্রিয়াশীল, মরণোন্মুখ। শিল্পের অবাধ বিকাশের পথে এই পুঁজিবাদই আজ অন্তরায়। পুঁজির প্রতিনিধিরা ফেব্রুয়ারি বিপ্লবের মধ্য দিয়ে রাশিয়ার ক্ষমতায় বসেছে। বুর্জোয়ারা আজ আর বুর্জোয়া বিপ্লব অতীত দিনের মতো করতে পারে না, সর্বহারাশ্রেণীকেই বুর্জোয়া বিপ্লবের অপূরিত কাজগুলি করতে হবে। যেহেতু বুর্জোয়াশ্রেণী রাজনৈতিক ক্ষমতা দখল করেছে এবং তাদের ক্ষমতাচ্যুত করতে হবে, তাই রাশিয়ার বিপ্লব হবে ‘সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব’। এই পুঁজির ক্ষমতাকে এখনই উৎখাত করতে হবে। না হলে শিল্পের অবাধ বিকাশ সম্ভব নয়, যুদ্ধের অবসানও অসম্ভব। যুদ্ধের অবসান ঘটাতে হলে রাষ্ট্রের ক্ষমতা আসা চাই সর্বহারা-শ্রেণী ও তাদের মিত্র গরিব কৃষকদের হাতে। একমাত্র সমাজতান্ত্রিক সরকারই জনগণকে দিতে পারে শান্তি, রুটি ও স্বাধীনতা। একমাত্র সেই গভর্নমেন্টই দেশকে নিয়ে যেতে পারে সমাজতন্ত্রের পথে। সংসদীয় রিপাব্লিক নয়, শ্রমিক-সোভিয়েত থেকে সংসদীয় রিপাব্লিকে ফিরে যাওয়াটা হবে পিছু হটা। ফলে গড়ে তুলতে হবে, শ্রমিক-খেতমজুর ও কৃষক প্রতিনিধিদের সোভিয়েত রিপাব্লিক। অতএব বলশেভিক আওয়াজ হবে ঃ অস্থায়ী গভর্নমেন্টকে সমর্থন নয়। সকল ক্ষমতা সোভিয়েতের হাতে!

বহু তর্ক-বিতর্ক ও আলাপ-আলোচনার পর বলশেভিক পার্টি লেনিনের ‘এপ্রিল থিসিস’র প্রতি সমর্থন জানালো এবং রাশিয়ায় সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের প্রস্তুতি গড়ে তোলার জন্য বলশেভিকদের ডাক দেওয়া হ'ল।

এ প্রসঙ্গে ভারতবর্ষের বিহারের রামগড়ে আপসহীন বিপ্লবী নেতা সুভাষচন্দ্রের একটি ভাষণের অংশবিশেষের উল্লেখ করতে হয়। ১৯৪০-এর ১৯ মার্চ অনুষ্ঠিত আপসবিরোধী সম্মেলনে প্রদত্ত সভাপতির ভাষণে তিনি, প্রাজ্ঞ নেতৃত্বের কেন প্রয়োজন সে প্রসঙ্গে উদাহরণ দিতে গিয়ে বলেছিলেন, ‘‘১৯১৭ সালে রাশিয়ায় অক্টোবর বিপ্লব কীভাবে পরিচালনা করা উচিত সে সম্বন্ধে কারও স্পষ্ট ধারণা ছিল না। অধিকাংশ বলশেভিক সে সময় অন্যান্য দলের সঙ্গে কোয়ালিশনের কথা ভাবছিলেন। একমাত্র লেনিনই সর্বপ্রকার কোয়ালিশনের বিরোধিতা করে ‘সোভিয়েতের হাতে সব ক্ষমতা চাই’ — এই আহ্বান দিয়েছিলেন। সংশয় ও দোদুল্যমানতার মধ্যে লেনিনের এই সময়োচিত নেতৃত্ব না পেলে রুশ ইতিহাসের গতি কী হত তা কে বলবে? লেনিনের এই অভ্রান্ত প্রজ্ঞা শেষ পর্যন্ত ভবিষ্যদ্‌বাণী রূপে প্রতিভাত হয়েছে, তা রাশিয়াকে বিপদের থেকে ... রক্ষা করেছে।’’

কিন্তু সেদিন লেনিনের এই ‘এপ্রিল থিসিস’ বিপ্লবী সর্বহারা-শ্রেণীর শত্রুদের ভয়ঙ্কর খেপিয়ে তুলেছিল। বুর্জোয়া পত্রপত্রিকায় লেনিনের বিরুদ্ধে জঘন্যতম কুৎসা প্রচার চলে। লেখা হয়, জার্মান সাম্রাজ্যবাদকে সাহায্য করার জন্যই লেনিনের এই এপ্রিল থিসিস। বুর্জোয়া প্রচারে বিভ্রান্ত হয়ে একদল লোক রাস্তায় মিছিল করে স্লোগান দেয় — লেনিনের মাথা চাই। মেনশেভিক ও সোস্যালিস্ট রেভোলিউশনারিদের পত্র-পত্রিকায় লেখা হতে লাগল — রাশিয়ার বিপ্লবী গণতন্ত্রের শত্রু কালাপাহাড় লেনিন। রাশিয়ায় যিনি মার্কসবাদের শিক্ষক বলে পরিচিত সেই প্লেখানভ বললেন, লেনিনের ‘এপ্রিল থিসিস’ হচ্ছে নৈরাজ্যবাদ ও ব্ল্যাঙ্কিবাদ।

জুন মাসের গোড়ার দিকে অনুষ্ঠিত হ'ল সোভিয়েতসমূহের প্রথম সারা রুশ কংগ্রেস। মোট প্রতিনিধি ছিলেন ১০৯০ জন, তাঁদের মধ্যে বলশেভিক প্রতিনিধির সংখ্যা মাত্র ১০৫। অধিকাংশ প্রতিনিধি ছিলেন মেনশেভিক ও সোস্যালিস্ট-রেভোলিউশনারি দলের। এমনি একটি সভায় বলশেভিকরা তাঁদের বক্তব্য কাউকে শোনাতে পারবেন, এমন আশা বিশেষ ছিল না।

পেত্রোগ্রাদ সোভিয়েতের কার্যনির্বাহক কমিটির পক্ষ থেকে বক্তৃতা দিলেন মেনশেভিক নেতা লীবের। তারপরে বক্তৃতা দিতে উঠলেন কোয়ালিশন গভর্ণমেন্টের ডাক-তার মন্ত্রী মেনশেভিক নেতা ৎসেরেতেলি। সোভিয়েত গভর্ণমেন্ট গড়ে তোলার জন্য বলশেভিকদের প্রস্তাব নাকচ করে দিয়ে তিনি বললেন, বর্তমানে রুশদেশে এমন পার্টি একটিও নেই যে বলতে পারে, আমাদের হাতে ক্ষমতা ছেড়ে দিয়ে তোমরা সরে দাঁড়াও, আমরা তোমাদের জায়গা নিচ্ছি।

শ্রোতারা নির্বাক। এমন সময়ে হলঘরের মাঝখান থেকে লেনিন শান্ত ও দৃঢ় কণ্ঠে বলে উঠলেন, ‘হ্যাঁ এমন একটি পার্টি আছে!’

তারপর তিনি মঞ্চে উঠলেন। বক্তৃতায় তিনি বিশ্লেষণ করে দেখালেন, মেনশেভিক ও সোস্যালিস্ট-রেভোলিউশনারিরা যে বিপ্লবী গণতন্ত্রের কথা বলছে তা আসলে বিপ্লবী নয়, বুর্জোয়া গণতন্ত্র। রুশদেশের বিপ্লবে জনগণ সৃজনশীল উদ্যোগের পরিচয় দিয়েছেন, তাঁরা সৃষ্টি করেছেন সোভিয়েত, যার মধ্যে রূপ পেয়েছে প্রকৃত গণতন্ত্র। এই সোভিয়েতকেই সমস্ত ক্ষমতা হাতে নিতে হবে। সোভিয়েতের বিরোধিতা করার মতো গোষ্ঠী বা শ্রেণী রুশদেশে নেই। তিনি আরও বললেন, বিপ্লব কারও মর্জিমাফিক চলে না। বিপ্লবের সময়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তাল ঠোকা যায় না — হয় এগিয়ে যেতে হয়, নয়তো পিছিয়ে পড়তে হয়।

(চলবে)

কমরেড স্বপন রায়চৌধুরী সংগ্রামের কিছু উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত রেখে গেছেন

চারের পাতার পর

তাঁর মধ্যে ছিল এবং সেটা প্রতিফলিত হত তার আচারে-ব্যবহারে, মেলামেশার মধ্য দিয়ে। সংস্কৃতি আছে কি নেই, তা বোঝার একমাত্র মাপকাঠিই হচ্ছে এই আচার-ব্যবহার। প্রবন্ধে, বক্তৃতায় সংস্কৃতি নিয়ে অনেক বড় বড় কথা বলা চলে, কিন্তু জীবনে আচরণে নূতন আদর্শকে প্রতিফলিত করাটাই আসল কথা। আমি ট্রেনে-বাসে যাচ্ছি, বিশেষ আলোচনা করছি না, কিন্তু আমার অবস্থান, সহযাত্রীদের প্রতি আমার আচরণ — এসব থেকেই অপরে বুঝবে মানুষটা আলাদা জাতের। পাড়ায় মিশছি, পাঁচজনের বিপদে আপদে ছুটছি, অন্যেরা বোঝে, এর থেকে কিছু শেখার আছে। এটা অর্জন করতে হলে, প্রত্যেককেই তার তার জায়গা থেকে একটা স্বকীয় আভ্যন্তরীণ সংগ্রাম করতে হবে। কেউ কেউ ছোটবেলায় বাবা, বা মা-ঠাকুরমা, দিদিমা, প্রতিবেশী কেউ, অথবা মাষ্টারমশাই — এ ধরনের কারো সংস্পর্শে এসে মহৎ গুণাবলীর আঁচ- তাপ থেকে খানিকটা অজান্তেই অনুকরণ-অনুসরণের পথে কিছু মূল্যবোধের অধিকারী হয়। কিন্তু পরবর্তীকালে সচেতনভাবে বুদ্ধির সাহায্যে একে রক্ষা করতে না পারলে খারাপ সংসর্গে এগুলি নষ্ট হয়ে যায়। আবার ছোটবেলায় এইভাবে মূল্যবোধ অর্জনের সুযোগ না থাকলেও পরবর্তীকালে উন্নত জ্ঞানের প্রভাবে বুদ্ধির সাহায্যে নিরন্তর সংগ্রাম চালিয়ে একে অর্জন করা যায়। ফলে চরিত্র, মূল্যবোধ অর্জনের জন্যও সংগ্রাম করতে হয়। আবার প্রতিকূল পরিবেশে একে রক্ষা করার জন্যও সংগ্রাম করতে হয়। সেখানে অনেক কিছু ছাড়তে হয়, প্রয়োজনে অনেক প্রিয়জনের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করতে হয়। অতীতে যে অভ্যেস আমার গড়ে উঠেছিল, বা চাওয়া-পাওয়ার জগৎ আমার গড়ে উঠেছিল, চাওয়া পাওয়াকে ভিত্তি করেই আমার দুঃখ-ব্যথা-আনন্দের বোধ গড়ে উঠেছিল, তাকে বর্জন করতে হয়। কমরেড স্বপনের সাথে আমি কাজ করেছি অনেক দিন। দেখেছি কোনও বিষয়ে দু'বার তাকে বলতে হয়নি। একই বিষয়ে ভুল-ঠিক নিয়ে দু'বার তাকে বোঝাতে হয়নি।

তার চরিত্রের আরেকটা বৈশিষ্ট্য আগাগোড়াই ছিল — সে যে কোথাও নেতা, একথা বোঝার কারোর উপায় ছিল না। একজন কমরেড যথার্থই বলেছে, অসুস্থ হওয়ার পর কলকাতায় এসে স্বপন যখন খানিকটা সুস্থ হয়েছিল, তখন সে দমদমে কাজ করেছে কমরেড রবীন রায়ের অধীনে। এই রবীনের হয়তো তখন কিশোর বয়স যখন দমদমে স্বপন সংগঠন গড়ছিল, রবীনকে যুক্ত করতে সেও সাহায্য করেছে। তাঁকেই পরে লোকাল লীডার মেনে কাজ করতে স্বপন কোনও দ্বিধা করেনি। সেই রবীনকে কমরেড শিবদাস ঘোষ একদিন বলেছিলেন, যে যথার্থ বড় সেই পারে এভাবে কাজ করতে। পুরুলিয়াতেও একই জিনিষ দেখেছি। ১৯৬৫ সালে কমরেড শিবদাস ঘোষ কমরেড স্বপনকে পুরুলিয়ায় পাঠানোর জন্য সিলেক্ট করেন। তখন পুরুলিয়ার সংগঠন প্রায় প্রাথমিক পর্বে।

পার্টি যখনই স্বপনকে বলেছে, পুরুলিয়ায় যেতে হবে, তৎক্ষণাৎ সে তৈরি। এক একজন গুরুত্বপূর্ণ কমরেডের ক্ষেত্রেও অনেকসময় দেখা যায়, পুরানো জায়গা তাঁরা সহজে ছাড়তে চান না। যে ফ্রন্টে বা যে লোকালে তাঁরা আছেন, তার সাথে এমন আবেগের সম্পর্ক তাঁর তৈরি হয়ে যায় যে, নূতন কোথাও দায়িত্ব দিলে মানসিক অসুবিধা দেখা দেয়, আনন্দের সাথে কাজ করতে পারেন না। কিন্তু স্বপনকে একটিবার মাত্র পার্টি বলেছে, পাজামা-পাঞ্জাবী পরে, কাঁধে ঝোলা ব্যাগ নিয়ে সে পুরুলিয়া চলে গেছে। ওর কর্মসাধনার সব থেকে বড় প্রতিফলন ঘটেছে পুরুলিয়ায়। ওখানকার কমরেডরা স্বপনের এই ভূমিকাকে অত্যন্ত শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করে। ঐ জেলার নেতৃস্থানীয় চারজন কমরেডের সাথে আমার আজ কথা হয়েছে, আন্দোলনের কাজে ব্যস্ত থাকায় আজ তাঁরা আসতে পারেননি। প্রত্যেকেই স্বপনের কথা বলতে গিয়ে কেঁদে ফেলেছেন। কমরেড প্রণতি ভট্টাচার্য বলেছেন, স্বপনদা না থাকলে আমি হয়তো পার্টি জীবনে এতটা আসতেই পারতাম না। কমরেড ভাস্কর ভদ্র বলেছেন, স্বপনবাবুকে ভোলা যায় না, উনি অত্যন্ত আপন ছিলেন। রাতের পর রাত কত আলোচনা হয়েছে, ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন, কিন্তু ইয়ার ছিলেন না, শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন। ঐ জেলার ট্রেড ইউনিয়ন নেতা ডি কে মুখার্জীও গভীর আবেগের সাথে জানালেন, স্বপনদাই আমাকে রামকৃষ্ণ মিশনের প্রভাব থেকে পার্টিতে এনেছেন, এরকম আরও অনেককে এনেছেন। এখানে শ্রমিক আন্দোলন শুরু করেছিলেন। পার্টি নেতা নির্মল মণ্ডলও তাঁর সম্পর্কে গভীর শ্রদ্ধা ব্যক্ত করেছেন। দু' দফায় স্বপন পুরুলিয়ায় কাজ করেছে। '৬৫ সাল থেকে '৭৪ সাল, পরে আবার '৮২ সাল থেকে '৮৯ সাল। তারপর আর যায়নি। এত দিন পার হয়ে গেল, অথচ এই সিনিয়র লিডারদের মনে আজও কী গভীর শ্রদ্ধা ! প্রত্যেকেরই ফোনে কথা বলতে বলতে কণ্ঠ অশ্রুরুদ্ধ হয়ে যায়। এই শ্রদ্ধা, এই ভালবাসা, এভাবে অপরের অন্তরে বেঁচে থাকা, এটাই সবচেয়ে বড় প্রাপ্তি একজন বিপ্লবীর জীবনে। এ শ্রদ্ধা ও ভালবাসা সার্কুলার দিয়ে, নির্দেশ পাঠিয়ে, কোনও পদের জোরে পাওয়া যায় না। পাওয়া যায় একমাত্র নিজ গুণে, নিজের চরিত্রের জোরে।

স্বপন পুরুলিয়া জেলার ঝালদায় গালা শ্রমিক ইউনিয়ন, পুরুলিয়া শহরে প্রেস ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন গড়ে তুলেছিল। সাঁওতালডিহিতে কোল ওয়াসারি, থার্মাল পাওয়ার, রোপওয়ে ইউনিয়ন গড়ে তুলেছিল। পারবেলিয়াতে কোল ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন গড়ে তোলাতেও তাঁর ভূমিকা ছিল। আড়ষা, বাগমুণ্ডি সহ জেলার নানা থানায় স্বপন কৃষক ও ক্ষেতমজুর সংগঠন গড়ে তোলাতেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিল। ঐ জেলায় রঘুনাথপুর কলেজে ডি এস ও সংগঠন গড়ে তোলায়, ইউনিয়ন জয় করায় ও-ই নেতৃত্বকারী ভূমিকা নিয়েছিল। সর্বোপরি জেলায় পার্টি গড়ে তোলায়, বেশ কিছু শ্রমিক-কৃষক-ছাত্র-যুবক-মহিলাকে পার্টিতে যুক্ত করানোয় বিশেষ ভূমিকা নিয়েছিল।

অনেক কমরেডই ট্রেড ইউনিয়ন করেন, কিন্তু ইউনিয়নের কাজকর্মের বাইরে তাঁরা শ্রমিকদের আনতে পারেন না। স্বপন কীভাবে পার্টির রাজনীতিকে ট্রেড ইউনিয়নে নিয়ে যেতে হয়, ট্রেড ইউনিয়ন থেকে কীভাবে বিপ্লবী কর্মী সংগ্রহ করতে হয়, কমরেড ঘোষের শিক্ষানুযায়ী তার দৃষ্টান্ত স্থাপন করে গেছে। ওর আরেকটা বড় গুণ ছিল ছোট-বড় সকলের সাথেই আপন হয়ে মিশতে পারত, সকলেই মন খুলে ওর সাথে কথা বলতে পারত, এভাবে সকলকেই অনুপ্রাণিত করতে পারত। বিপ্লবী আন্দোলন এক দীর্ঘ জটিল সমস্যাসঙ্কুল প্রক্রিয়া। এর মধ্যে ভালমন্দ, ন্যায়-অন্যায়, বিচার-অবিচার সবই থাকে। আঘাত পাওয়ার, দুঃখ পাওয়ার ঘটনাও থাকে। এসবের মধ্যেও মনের প্রশান্তি বজায় রাখা, কর্মসাধনাকে অব্যাহত রাখা সহজ কথা নয়। যতদিন ও সুস্থ ছিল, মূলত এটা অক্ষুণ্ণ রাখতে পেরেছে। যেখানে যা বলার নয়, সেখানে কখনও তা ব্যক্ত করত না। কমরেড শিবদাস ঘোষ নির্ধারিত বিপ্লবী আচরণবিধি অনুসরণ করার সংগ্রাম স্বপন যোগ্যতার সঙ্গেই চালিয়ে গেছে।

দক্ষিণ কলকাতায় ডি এস ও-র কাজ দিয়ে তার শুরু, দমদমে তার বিকাশ এবং তার চূড়ান্ত পরিণতি ঘটেছে পুরুলিয়ায়। এখন আমাদের কর্মীদের অনেকের মধ্যে মধ্যবিত্তসুলভ জীবনের প্রভাব পড়ছে। ইলেকশনের সময় কর্মীরা দু-পাঁচ দিনের জন্য বাইরে যেতে পারে। আরেকটা হচ্ছে, যেখানেই পার্টি বলছে একেবারে চলে যাওয়া, সেখানেই খুশি মনে কাজ করা। এই সংগ্রামটা কম কথা নয়। স্বপন বিপ্লবী রাজনীতিকে কিছু প্রোগ্রাম, কিছু কাজ করা এভাবে নেয়নি, নিয়েছিল জীবনসাধনা হিসাবে। জীবনকে বিপ্লবের সাথে একাত্ম করার ক্ষেত্রে সে যথেষ্ট এগিয়েছিল। অসুস্থতা যদি তার জীবনসংগ্রামকে ব্যাহত না করত, তবে সে আরও এগোত এবং আজকে পার্টির অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব নেওয়ার কথাই তাঁর ছিল।

আজ পার্টির সামনে সম্ভাবনা দেখা দিচ্ছে। পার্টি গঠনের প্রথম দিকে এবং গঠনের পরপরই যে কমরেডরা এসেছিলেন, পার্টির অগ্রগতির ক্ষেত্রে তাঁদের প্রত্যেকের ভূমিকা আছে। সেসময় পার্টির ডাকে কমরেড শিবদাস ঘোষের শিক্ষায় ঘরবাড়ি-কেরিয়ার ছেড়ে যাঁরা এসেছেন, তাঁদের সংগ্রাম কম নয়। প্রবল বাধাবিপত্তি তাঁদের অতিক্রম করতে হয়েছে। আজ পার্টি পশ্চিমবাংলার ও ভারতবর্ষের জনসাধারণের সামনে একটা গুরুত্বপূর্ণ জায়গায় এসে দাঁড়িয়েছে। কমরেড নীহার মুখার্জীর নেতৃত্বে রাজ্যে রাজ্যে নানা আন্দোলন ও শ্রেণীসংগ্রাম চলছে। অসংখ্য মানুষ আশাভরসা নিয়ে এস ইউ সি আই'র দিকে তাকিয়ে আছে। শাসক বুর্জোয়াশ্রেণী, শাসকদল কংগ্রেস-বিজেপি-সিপিএম আতঙ্কের সাথে দেখছে এস ইউ সি আই-কে। এই দলের অগ্রগতি মানেই তাদের বিপদ। অন্যদিকে মানুষ চাইছে এস ইউ সি আই শক্তিশালী হোক, তারা সমর্থন নিয়ে দু'হাত বাড়িয়ে দিয়েছে।

শুধু পশ্চিমবঙ্গ নয়, ভারতবর্ষে, এমনকী ভারতবর্ষের বাইরেও পার্টি সম্পর্কে আকর্ষণ বাড়ছে। সদ্য কমরেড মানিক মুখার্জী জর্ডন থেকে এসেছেন। জর্ডনের পার্টি তাদের কংগ্রেসে আমন্ত্রণ জানিয়েছিল আমাদের। কমরেড রণজিৎ ধর ইতিপূর্বে ব্রাসেলস, ফিলিপাইন্সে গেছেন, কমরেড কৃষ্ণ চক্রবর্তী গেছেন। বাইরে আমাদের পার্টি সম্পর্কে প্রবল আকর্ষণ। কমরেড শিবদাস ঘোষের কিছু কিছু বই বিভিন্ন বিদেশি ভাষায় অনূদিত হয়েছে। এই অবস্থায় আমাদের চাই কমরেড স্বপন রায়চৌধুরীর মতো আরও অসংখ্য কমরেড। নতুন কর্মী আসছে একথা ঠিক, কিন্তু কর্মীদের আদর্শগত মান, সাংস্কৃতিক ও সাংগঠনিক মান আরও উন্নত হওয়া দরকার। আগে যে সামাজিক পরিবেশ ছিল, এখন তা নেই। পুঁজিবাদের আরও পচন ধরেছে। পুঁজিবাদী নোংরা সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলের মধ্যে আমরা বিরাজ করছি, তার প্রভাবও আমাদের পার্টি-জীবনে পড়ছে। এই অর্থে আজকের কমরেডদের বিপ্লবী জীবনসংগ্রাম অনেক কঠিন। আবার এর বিরুদ্ধে লড়বার শক্তিও আমাদের হাতে কমরেড শিবদাস ঘোষ জুগিয়ে গেছেন। সেটাকে হাতিয়ার করেই আমাদের এগোতে হবে। 'আপনি আচরি ধর্ম অপরে শিখাও' পুরনো দিনের এই যে কথাটা, তা সর্বযুগেই সত্য। শুধু কী আচরণ করব, সেটা যুগ থেকে যুগে পাল্টে যায়। বুর্জোয়া স্বাধীনতা আন্দোলন, আর সর্বহারা বিপ্লবী আন্দোলনের আচরণ এক হবে না। বিপ্লবের কনটেন্ট ও ফর্মেও পার্থক্য আছে, আদর্শ ও সংস্কৃতিতে পার্থক্য আছে। আমার আচরণের দ্বারাই আমি অপরকে শেখাব। সংস্কৃতি খুব ছোট্ট কথা, কিন্তু অর্জন করা কঠিন। কালচার আয়ত্ত করেছি মানে 'হবে কি হবে না', 'পারব কি পারব না', 'সকলের দ্বারা সব হয় কিনা' — এসব কথা আর নয়, বুঝেছি মানেই ক্রিয়ায় তার প্রতিফলন ঘটছে। সফলতা, বিফলতা যাই হোক, বিপ্লবী কর্মকাণ্ডে মগ্ন হয়ে আছি। এটাই একমাত্র অবস্থান। ঘরে-বাইরে, সুখে-দুঃখে, প্রেমে-ভালবাসায় এই এথিক্সের সুরই বহন করে যাচ্ছি। এই শিক্ষাই কমরেড শিবদাস ঘোষ দিয়েছিলেন। তিনি বলেছেন, শুধু বাঁচা নয়, মনুষ্যত্ব নিয়ে, রুচিসম্মত জীবন নিয়ে বাঁচো। বুদ্ধি চাই, কিন্তু বুদ্ধির সাথে হৃদয়বৃত্তি যুক্ত না হলে বুদ্ধি বিপথগামী হবে। আর উন্নত সংস্কৃতি না থাকলে হৃদয়বৃত্তি থাকে না। বুদ্ধি আর চালাকি এক নয়। আমরা কাজের মধ্যে কৌশল নিই, ট্যাকটিক্স গ্রহণ করি। কিন্তু ট্যাকটিক্স আর প্র্যাগম্যাটিজম এক নয়। স্ট্যালিন বলেছিলেন, ''ট্যাকটিক্স ইজ দ্য ডে টু ডে ইম্‌প্লিমেন্টেশন অভ দ্য স্ট্র্যাটেজি''। এই স্ট্র্যাটেজিই হচ্ছে মূল, যার সঙ্গে যুক্ত আছে সংস্কৃতি। আদর্শবিচ্যুত, সংস্কৃতিবিচ্যুত একটা ট্যাকটিক্স হচ্ছে আশু লক্ষ্য পূরণের উদ্দেশ্যে নিকৃষ্ট বাস্তববাদ। আমরা প্র্যাগম্যাটিস্ট নই। আজকাল 'প্র্যাগম্যাটিজম' এসে গেছে, অর্থাৎ একটু চালাকি করলাম, ম্যানেজ করলাম। এইসব মিথ্যাচার দিয়ে কখনও মহৎ কাজ হয় না। তাই কারও বুদ্ধি আছে, কিন্তু সংস্কৃতি নেই, এটা তাকে বিপথগামী করে দেবে। সংস্কৃতির পরিচয় কিসে ? দুঃখের দিনে, বিপদের দিনে, যখন আঘাত পাচ্ছি, যখন নিজেকে সংযত রাখাই কঠিন, তার পরিচয় তখনই। যখন চরিত্র নষ্ট হওয়ার উপাদান প্রচুর, তার রসদ ভিতরে-বাইরে মজুত, তখনই আমার চরিত্রের পরীক্ষা। কমরেড স্বপন রায়চৌধুরী এই চরিত্র অর্জনের সংগ্রামে লিপ্ত ছিল কিন্তু পূর্ণ বিকশিত হওয়ার আগেই দুরারোগ্য ব্যাধি তাকে গ্রাস করল, যা আমাদের সকলের দুঃখ এবং ব্যথার। আমাদের থেকে বয়সে ছোট হলেও কমরেড স্বপন কমরেড শিবদাস ঘোষের শিক্ষার ভিত্তিতে সংগ্রামে বেশ কিছু উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত রেখে গেছে, যেটা থেকে সকলের শেখার আছে। বিশেষ করে নতুন কর্মীদের বলব, শিবদাস ঘোষের ছাত্র হিসাবে কমরেড স্বপন যেভাবে লড়াই করে গেছে, তার থেকে শিক্ষা নিয়ে তাঁরা আরও দায়িত্ব নিতে এগিয়ে আসুন, আরও বড় হোন — এটাই কমরেড স্বপনকে স্মরণ করার মূল তাৎপর্য। এখানেই আমি শেষ করছি।

কমরেড ভবেশ গাঙ্গুলী এবং কমরেড শঙ্কর সাহাও স্মরণসভায় বক্তব্য রাখেন।

কমরেড শিবদাস ঘোষের উপর রচিত সঙ্গীত ও আন্তর্জাতিক পরিবেশনের মধ্য দিয়ে স্মরণসভা শেষ হয়।

বাঁকুড়া

বিডিওকে ঘেরাও করল চাষীরা

বড়জোড়া ঘুটগড়িয়ার ১৬টি গ্রামের শত শত চাষী ৮ ডিসেম্বর বড়জোড়া বিডিওকে ঘেরাও করে রাখল প্রায় দু'ঘণ্টা। ট্রান্স দামোদর ল্যান্ড লুজার অ্যান্ড ওয়ার্কার্স অ্যাসোসিয়েশন এই ঘেরাও-এর উদ্যোগ নিয়েছিল। সিপিএম সরকার কৃষিজমি অধিগ্রহণ করেছে দু'লক্ষ টাকা একর দামে, যার বর্তমান বাজার মূল্য সাত লক্ষের বেশি। অধিগ্রহণের পর সেই জমি কার্যত চলে যাবে ঠিকাদারদের হাতে। ওয়েস্ট বেঙ্গল মিনারেল ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড ট্রেডিং করপোরেশন নাম-কা-ওয়াস্তে থাকছে সামনে, চাষীদের প্রতারণা করার জন্য। খোলামুখ খনির অধিকার দিলে একদিকে চাষীরা যেমন জমি হারাবে, কাজ হারাবে, তেমনি পরিবেশ হবে ভয়াবহ দূষিত, খাদানের বাইরের জমিও হবে অনুর্বর এবং শুখা। ফলে অন্যান্য চাষীরাও গ্রাম ছাড়তে বাধ্য হবেন। খোলা খনিতে খরচ পড়ে দশ ভাগের এক ভাগ মাত্র, এতে প্রচুর লাভ করবে ঠিকাদাররা। সাথে বেহিসাবি কয়লা দিনেরাতে পাচার হবে অনেক, যার বখরা মিলবে ঠিকাদারদের ও তাদের বন্ধু ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক নেতাদের, যারা উন্নয়নের ধুয়া তুলছে। খোলামুখ কোলিয়ারির সিদ্ধান্ত বাতিল, পুনর্বাসন, জমির উপযুক্ত দাম ও চাকরি প্রভৃতি বিষয় নিয়ে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের সাথে আলোচনায় বসার দাবি জানিয়েছেন তাঁরা।

সিঙ্গুর নিয়ে সিপিএম মিথ্যাচার চালিয়ে যাচ্ছে

চাষের জমি কেড়ে এখন শিল্পায়ন হচ্ছে — সরকারি বয়ান এইরকম। রাজ্যে যত শিল্পায়ন হচ্ছে তত বেকার বাড়ছে। প্রথমে হলদিয়া পেট্রোকেম, তারপর 'রক্ত দিয়ে গড়া বক্রেশ্বর', এখন চলছে 'টাটার মোটরগাড়ি'। কিন্তু বেকার কমছে না। নথিভুক্ত বেকার গত বছর ছিল প্রায় ৭৫ লক্ষ, অলিখিত বেকারের সংখ্যা কয়েক কোটি।

রাজ্যের সিপিএম নেতারা আবার 'মার্কসবাদী', তাই 'বিশ্বায়ন বিরোধী'। তাঁরা বলছেন, বিশ্বজুড়ে এখন চলছে কর্মসংস্থানহীন শিল্পায়ন, আর পশ্চিমবঙ্গে তাঁরা করছেন 'কর্মসংস্থানমুখী শিল্পায়ন'। আবার বেকায়দায় পড়লে তাঁরাই বলছেন — আমরা তো সমাজতন্ত্র করছি না; এটা পুঁজিবাদী উন্নয়ন। অর্থাৎ পুঁজিবাদের মধ্যেই তাঁরা কর্মসংস্থানমুখী শিল্পায়ন করছেন, যা আমেরিকা, ইংল্যান্ড, জার্মানির পাকা ওস্তাদরাও পারছে না। কিন্তু কোন্ যাদুমন্ত্রে এই ভোজবাজি ঘটছে তার হদিস তাঁরা দিচ্ছেন না। আসলে তাঁরা গল্পের গরু গাছে তুলছেন। নির্ভেজাল মিথ্যা কথা অসঙ্কোচে বলার একটা নির্লজ্জ ক্ষমতা তাঁরা অর্জন করেছেন। তার দুটো নমুনা দেখা যাক।

নমুনা এক — সিপিএম বলছে, সিঙ্গুরে যত চাষী উচ্ছেদ হবে সবাই কাজ পাবে কারখানা হলে। কী করে পাবে? উত্তরটা সহজ, পুঁজি বিনিয়োগ হলেই কাজের সুযোগ সৃষ্টি হবে। কত পুঁজি বিনিয়োগ হবে? টাটা দেবে হাজার কোটি, সহযোগী শিল্পের মালিকরা দেবে ৫০০ কোটি, অর্থাৎ দেড় হাজার কোটি। সিপিএমের দেওয়া তথ্য অনুযায়ীই জমির মালিক ৩৩৭০, বর্গাদার ৪৭০ জন (গণশক্তি ৭-১২-০৬) বলাবাহুল্য বর্গাদারের সংখ্যা বাস্তবে অনেক বেশি। বেসরকারি হিসাবে বর্গাদার ২৪০০র কম নয়, এর ওপর আছে খেতমজুর। সব মিলিয়ে সিঙ্গুরে কাজ হারাবে কমপক্ষে হাজার সাত-আট পরিবার, ক্ষতিগ্রস্ত হবে আনুমানিক প্রায় হাজার তিরিশেক মানুষ। দেড় হাজার কোটি টাকা বিনিয়োগে কত কাজের সুযোগ হতে পারে? হিসাবটা দেখা যাক।

প্রথমেই বলা দরকার, অটোমোবাইল শিল্প শ্রমনিবিড় শিল্প নয়, অত্যাধুনিক কম্পিউটার চালিত অটোমেটিক শিল্প, এই শিল্পে এখন দুনিয়াজোড়া মন্দা এবং ছাঁটাই চলছে। মন্দা কাটাতে ব্যাপক অটোমেশন ও ছাঁটাইয়ের ফলে এই শিল্পের তিন বিশ্বসেরা — জেনারেল মোটরস, ফোর্ড এবং ক্রাইসলার ১৯৮০ থেকে '৯৪ সালের মধ্যে অর্ধেক শ্রমিক ছাঁটাই করেছে। এদের কারখানায় কর্মরত ৭ লক্ষ ৫০ হাজার শ্রমিকের মধ্যে ৩ লক্ষ ৭৫ হাজার ছাঁটাই হয়েছে '৯৪ সালের মধ্যে। এরপরও ক্রমাগত ছাঁটাই চলছে। ১১ ডিসেম্বর বি বি সি'র খবর — ডাইমলার ক্রাইসলার আরও ১০ হাজার ছাঁটাই করবে। এসব ঘটছে মালিকশ্রেণীর স্বর্গরাজ্য পশ্চিমী দুনিয়ায়। এখানে টাটারা কী করবে তা বোঝার জন্য এই অভিজ্ঞতাই যথেষ্ট। বিশেষজ্ঞরা হিসাব কষে দেখিয়েছেন, সিঙ্গুরে টাটাদের প্রস্তাবিত কারখানায় বড় জোর ২০০-২৫০ জনের কাজ হতে পারে। এর মধ্যে রাজ্যে শুধু নথিভুক্ত বেকারের সংখ্যাই ৭৫ লাখ থেকে ৮০ লাখে পৌঁছে যাবে। এর কোনও জবাব সিপিএম নেতারা দেবেন কি?

নমুনা দুই — সিপিএম বলছে, সিঙ্গুরে ৭৫ ভাগ চাষীই নাকি জমি দিয়ে দিয়েছে। দিল্লিতে তাদের কেন্দ্রীয় কমিটির নেত্রী কৃদা কারাত বলেছেন — বিরোধীরা মিথ্যা বলছে, ৭৫ ভাগ চাষী 'স্বেচ্ছায়' জমি দিয়েছে এবং ২ ডিসেম্বর পুলিশ কাউকে তেমন মারেনি। এদিকে বামফ্রন্টের শরিকরা বলছে, পুলিশ সিঙ্গুরে চাষীদের ওপর অত্যাচার করেছে; রাজ্যের সিপিএম নেতারা পুলিশের 'বাড়াবাড়ির' নিন্দা করেছেন। স্বেচ্ছায় জমিদাতা হিসাবে প্রায় বারো হাজার জমি মালিকের মধ্যে ৪২ জনের সই করা কাগজ তাঁরা দাখিল করেছেন। 'টাটার কারখানা অবিলম্বে চাই' লেখা নতুন অ্যাপ্রন পরিয়ে দলীয় সভায় মুষ্টিমেয় চাষীকে তাঁরা হাজির করিয়েছেন। কিন্তু 'স্বেচ্ছায় জমিদাতার' সংখ্যা দৃষ্টিকটু রকম কম হওয়ার যে সাফাই গণশক্তি (১৩-১২-০৬) দিয়েছে, তা সিপিএম নেতাদের পক্ষেই সম্ভব। তাঁরা বলেছেন, মঙ্গলবার (১২-১২-০৬) চেক নেওয়ার দিন হওয়ায় অনেকে চেক নেওয়ার জন্য থেকে গিয়েছেন। প্রশাসন যাদের হাতে, চেক নেওয়ার দিনটা বদলাতে তাদের কোন অসুবিধা ছিল না। তাহলে তাঁরা সেটা করেন নি কেন? তাঁরা বলেছেন, মাত্র ৪২ জন সই করেছে, কারণ চিঠির বয়ান লেখার পর যেটুকু জায়গা ছিল তাতে ওই ৪২ জনের বেশি জমিদাতার সই ধরেনি। সত্যিই দুঃখের কথা! 'বাজারদরের চেয়ে অনেক বেশি দর' পেয়ে যাঁরা জমি দিলেন, একটা বাড়তি কাগজ কেনার পয়সা তাঁদের জুটল না! সাফাইটা যে খুবই কাঁচা, হয়ত তা বুঝেই তাঁরা নেতাদের নামে না দিয়ে জমিদাতা তিন কৃষকের মুখে গুঁজে দিয়ে গণশক্তির (১৩-১২-০৬) সাতের পাতায় পরিবেশন করেছেন। ঐদিনই গণশক্তির প্রথম পাতায় বেড়াবেড়ির চাষী গোপাল হাজীরের সচিত্র বয়ানে দেখা যাচ্ছে, তিনি খেতমজুরি করে এতদিন দিনে ৩৮ থেকে ৪০ টাকা পেতেন। কী সর্বনাশ! খেয়াল রাখা উচিত ছিল, এ রাজ্যে ন্যূনতম মজুরি দিনে ৬০ টাকা সিপিএম-ফ্রন্ট সরকারই ঠিক করেছে। তাহলে কি সিঙ্গুরের মতো উর্বর জায়গায়ও খেতমজুররা ন্যূনতম মজুরি পেতেন না? গণশক্তির গোপালবাবু এখন কারখানার নির্মাণ মজুর হিসাবে পাচ্ছেন দিনে ৬৮ টাকা। ৩৮ - ৪০ টাকায় তাঁর "ডালভাত যোগাড় করাই কষ্টকর ছিল।" ২৮-৩০ টাকা মজুরি বাড়তে ডাল-ভাত জোগাড়ের পরও "এখন সপ্তাহে চারদিন মাছ খাচ্ছি। সাতদিনই আমিষ।"

দৈনিক ৬৮ টাকা মজুরিতে পরিবারে সপ্তাহে সাত দিনই আমিষ খাওয়া যায়? মিথ্যাচারের এই হল বিপদ। মিথ্যা বলতে বলতে কোথায় থামতে হবে, তা ভুল হয়ে যায়।

প্রবীণ পার্টিকর্মীর জীবনাবসান

এস ইউ সি আই-এর উল্টোডাঙা-মানিকতলা আঞ্চলিক কমিটির পূর্বতন সম্পাদক কমরেড অনিল হোড় দীর্ঘ অসুস্থতার পর ১৫ ডিসেম্বর শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৪ বছর। মৃত্যুসংবাদ পেয়েই তাঁর বাড়িতে যান রাজ্য কমিটির সদস্য কমরেডস সাধনা চৌধুরী, তপন রায়চৌধুরী ও চিররঞ্জন চক্রবর্তী। আঞ্চলিক সম্পাদক কমরেড অজয় চক্রবর্তী সহ এলাকার কমরেডরাও উপস্থিত হন। কমরেড অনিল হোড়ের মরদেহ উল্টোডাঙা পার্টি অফিসে নিয়ে যাওয়া হয়। এলাকার শরৎ শিক্ষায়তনে কমরেড হোড় দীর্ঘদিন শিক্ষকতা করেছেন। এই স্কুলের শিক্ষক বঙ্গীয় প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির সম্পাদক কমরেড কার্তিক সাহা ও প্রাক্তন ছাত্রছাত্রীরা এসে মাল্যদান করে শ্রদ্ধা জানান। কমরেড অনিল হোড়ের স্ত্রী, পার্টির কলকাতা জেলা সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড হাসি হোড় অসুস্থ হয়ে ক্যালকাটা হার্ট ক্লিনিক অ্যান্ড হসপিটালে থাকায়, কমরেড হোড়ের মরদেহ হাসপাতালের সামনে নিয়ে যাওয়া হয়। ওখানে মাল্যদান করে শ্রদ্ধা জানান রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কলকাতা জেলা সম্পাদক কমরেড মানিক মুখার্জী এবং কমরেড হাসি হোড়।

১৯৫৪ সালে জয়নগরের বহড়ুতে থাকায় সময়ই তিনি প্রথম পার্টির সংস্পর্শে আসেন। কলকাতায় এসে বেলেঘাটায় থাকার সময় কমরেড মানিক মুখার্জী ও রাজ্য কমিটির প্রয়াত সদস্য কমরেড বাদল পালের সঙ্গে পরিচয় হয় এবং কমরেড হোড় এলাকায় পার্টির কাজ শুরু করেন। 'কে হোড়' কোম্পানিতে চাকরি পেয়ে কিছুদিনের মধ্যেই সেখানে কর্মচারী ইউনিয়ন গঠন করার উদ্যোগ নেন। ইউনিয়ন না করলে মালিক তাঁকে বাড়ি-গাড়ি ও প্রচুর টাকা দেবে বলে প্রস্তাব দেয়। কিন্তু কমরেড অনিল হোড় সেই প্রস্তাব ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করেন। ফলে তাঁর চাকরি চলে যায়। তিনি তখন চায়ের দোকানে দোকানে কেক ফেরি করেছেন। ভাই, বোন, স্ত্রী, কন্যা সকলকেই তিনি পার্টির সাথে যুক্ত করার জন্য চেষ্টা করেছেন। মেয়ের পড়াশোনার প্রশ্নে বলতেন, পার্টি ভাল করে করলে পড়াশোনাটাও হবে। পারিবারিক বিষয়েও তিনি নেতৃত্বের সাথে কথা বলেই সিদ্ধান্ত নিতেন। শিক্ষক জীবন থেকে অবসরগ্রহণের পর প্রাপ্ত পুরো টাকা পার্টির হাতে তুলে দিয়েছিলেন। কোনদিন স্ত্রীকে পার্টির কাজ করায় বাধা দেননি, বরং সাহায্য করেছেন যাতে স্ত্রী বেশি দায়িত্ব নিতে পারেন। কমরেড হাসি হোড় যখন পার্টির দায়িত্বশীল পদে গিয়েছেন, তখন উৎসাহ দিয়েছেন। অসুস্থ অবস্থাতেও যতদিন পেরেছেন, আঞ্চলিক পার্টি অফিসে গিয়ে বসেছেন। শিক্ষক হিসাবেও তিনি ছাত্রছাত্রীদের শ্রদ্ধা অর্জন করেছেন।

ক্যালকাটা হার্ট ক্লিনিক অ্যান্ড হসপিটাল থেকে তাঁর মরদেহ নিমতলা শ্মশানে নিয়ে যাওয়া হয়, সেখানেই শেষকৃত্য সম্পন্ন হয়।

কমরেড অনিল হোড় লাল সেলাম।

চুঁচুড়ায় গণঅবস্থানে সিঙ্গুরে অত্যাচারের ছবি দেখাতে দিল না পুলিশ

এ রাজ্যের পুলিশবাহিনী কী ভয়ঙ্কর স্বৈরাচারীর রূপ নিয়েছে, তার আর একটি উদাহরণ দেখা গেল ১৫ ডিসেম্বর হুগলির চুঁচুড়ায়। এদিন দলের পক্ষ থেকে সিঙ্গুরে কৃষকদের উপর পুলিশের বর্বর অত্যাচারের বিরুদ্ধে ডাকা প্রতিবাদ সভায় পুলিশি অত্যাচারের ছবি সম্বলিত একটি সিডি দেখানোর সময় পুলিশ জোর করে তা বন্ধ করে দেয়।

টাটা কোম্পানির হাতে অতি উর্বর কৃষিজমি তুলে দেওয়ার জন্য সিপিএম ফ্রন্ট সরকার সিঙ্গুরের কৃষকদের ওপর যেভাবে পুলিশি বর্বরতা চালিয়েছে এবং জোর করে তাদের জমি কেড়ে নিয়েছে, তার প্রতিবাদে রাজ্য জুড়ে জেলায় জেলায় এস ইউ সি আই -এর পক্ষ থেকে বিক্ষোভ আন্দোলন চলছে। এই আন্দোলনের ধারাবাহিকতায় গত ১৫ ডিসেম্বর দলের পক্ষ থেকে চুঁচুড়ার ঘড়ি মোড়ে দুপুর বারোটা থেকে সন্ধ্যা ছ'টা পর্যন্ত অবস্থান-সমাবেশের কর্মসূচি নেওয়া হয়েছিল। সমাবেশে বক্তব্য রাখেন ইউ টি ইউ সি-লেনিন সরণীর রাজ্য সম্পাদক কমরেড দিলীপ ভট্টাচার্য, এস ইউ সি আই হুগলি জেলা সম্পাদক কমরেড পরিমল সেন এবং জেলা কমিটির সদস্য কমরেড প্রদ্যুৎ চৌধুরী। এরপর পূর্ব নির্ধারিত ভাবেই সিঙ্গুরে পুলিশি অত্যাচারের ছবি সম্বলিত একটি সিডি দেখানোর ব্যবস্থা করা হয়। এমন সময় সভাস্থলে পুলিশবাহিনী এসে উপস্থিত হয় এবং অত্যন্ত ঔদ্ধত্যের সঙ্গে বলে যে, পুলিশি অত্যাচারের সিডি ওখানে দেখানো চলবে না এবং এই আদেশ মানা না হলে সভায় উপস্থিত প্রতিটি মানুষকে তারা গ্রেপ্তার করবে।

এই হচ্ছে সিপিএম ফ্রন্ট সরকারের পেটোয়া পুলিশবাহিনীর 'গণতান্ত্রিক' আচরণের ছবি!

তাপসী মালিককে হত্যার প্রতিবাদে গর্জে উঠুন

একের পাতার পর

একজন মহিলাকর্মী হাসপাতালে। ১৯ ডিসেম্বর সমস্ত জেলার পুলিশ সুপারের দপ্তরের সামনে মহিলারা বিক্ষোভ দেখাবেন, ২০ ডিসেম্বর জেলায় জেলায় এস ডি ও দপ্তর ঘেরাও হবে।

আপনারা জানেন, সিঙ্গুরে জমি রক্ষার আন্দোলনে আমাদের দল শুরু থেকেই আছে, আমরা তিনটি বন্‌ধ করেছি, ৫ ডিসেম্বর আমাদের দলের একক ডাকেই বন্‌ধ হয়েছে। ৯ ডিসেম্বর দিল্লি সহ ভারতের রাজ্যে রাজ্যে প্রতিবাদ হয়েছে। জেলায় জেলায় ডি এম অফিসে আইন-অমান্য, অবরোধ, অবস্থান লাগাতার চলছে। বর্বর পুলিশি জুলুমের শিকার হচ্ছে আমাদের কর্মীরা। আমাদের মহিলা কর্মীদের পুলিশ বিবস্ত্র করে নির্মমভাবে মেরেছে বালুরঘাটে, যার বিরুদ্ধে ১৬ ডিসেম্বর বালুরঘাটের মানুষ নিষ্প্রদীপ করে ধিক্কার জানিয়েছেন। আমাদের আন্দোলন চলবে। আমরা দাবি করছি —

১। তাপসী মালিকের হত্যায় অপরাধী জমি-পাহারাদারদের অবিলম্বে গ্রেপ্তার করতে হবে, তদন্তের নামে ঘটনা ধাপাচাপা দেওয়া চলবে না,

২। সিঙ্গুর থেকে অবিলম্বে ১৪৪ ধারা ও পুলিশ ক্যাম্প তুলে নিতে হবে,

৩। দখল করা জমি অবিলম্বে কৃষকদের ফেরত দিতে হবে।

তৃণমূল কংগ্রেস নেতৃত্ব আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করলে আমরা বলেছিলাম — সদ্য তিনটি বন্‌ধ হয়ে যাওয়ার পর আবার একটি বন্‌ধ-এর আহ্বান সমীচীন হবে না, আন্দোলনের অন্যান্য কর্মসূচি নিতে হবে। তবুও তাঁরা ৪৮ ঘণ্টা বন্‌ধ ডেকেছেন, যেহেতু এই ইস্যু নিয়ে আমরাও আন্দোলন করছি তাই আমরা এই বন্‌ধ-এর বিরোধিতা করছি না। আমাদের দীর্ঘস্থায়ী আন্দোলনের কর্মসূচি আমরা চালিয়ে যাব।

R. No 5268 / 60
Postal Registration No. SSRM/KOL/RMS/WB/RNP - 138/2004-06

আম্বেদকরের মূর্তি ভাঙার তীব্র নিন্দা করল এস ইউ সি আই

এস ইউ সি আই সাধারণ সম্পাদক কমরেড নীহার মুখার্জী ১ ডিসেম্বর এক বিবৃতিতে উত্তরপ্রদেশের কানপুরে একদল দুষ্কৃতী দ্বারা বাবাসাহেব আম্বেদকরের মূর্তি ভাঙা এবং তার জেরে মহারাষ্ট্রের কয়েকটি অংশে হিংসা ছড়ানোর ঘটনার তীব্র নিন্দা করেছেন। চূড়ান্ত নিন্দনীয় এই কাজের সুযোগ নানা হীন স্বার্থবাহী গোষ্ঠী যাতে নিতে না পারে সেজন্য তিনি জনগণকে সজাগ থাকার আহ্বান জানিয়েছেন। কমরেড নীহার মুখার্জী বলেন, বিশ্বায়ন এবং উদারীকরণের পর জনজীবনে শাসক বুর্জোয়াশ্রেণীর আক্রমণ যখন বহুগুণে বেড়ে গিয়েছে, যার বিরুদ্ধে জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে শ্রমজীবী মানুষের সংগঠিত দীর্ঘস্থায়ী আন্দোলন গড়ে তোলাই আজ জরুরি, তখন জনগণের ঐক্য রক্ষা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তিনি দেশবাসীর কাছে এইরূপ কোনও প্ররোচনায় পা না দিয়ে শান্ত থাকার আবেদন জানিয়ে বলেন, পুঁজিবাদী দমনপীড়নের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন তীব্রতর করেই এই ষড়যন্ত্রকে ব্যর্থ করতে হবে।

৯ ডিসেম্বর সারা ভারত প্রতিবাদ দিবসে বিক্ষোভ (উপরে) পাটনা, (নীচে) হায়দ্রাবাদ

সিঙ্গুর

রাজ্যে রাজ্যে প্রতিবাদ

সিঙ্গুরে উর্বর কৃষিজমি দখলের প্রতিবাদ আন্দোলনে সিপিএম সরকারের পুলিশের বর্বরোচিত হামলার বিরুদ্ধে এস ইউ সি আই-এর কেন্দ্রীয় কমিটির আহ্বানে ৯ ডিসেম্বর সারা ভারতে প্রতিবাদ দিবস পালিত হয়।

ত্রিপুরা

আগরতলায় কর্ণেল চৌমুহনী থেকে এক বিক্ষোভ মিছিল শহরের বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে বটতলায় শেষ হয়। উদয়পুরেও একটি প্রতিবাদ মিছিল শহর ঘুরে সুপার মার্কেটে এলে সেখানে প্রতিবাদ সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় বক্তব্য রাখেন কমরেডস বাবুল বণিক ও বিভুলাল দে।

মহারাষ্ট্র

নাগপুরের বৈদ্যনাথ চকে বিক্ষোভ প্রদর্শন করা হয়। কৃষিজীবীদের পিটিয়ে তাদের জমি দখল করে টাটাকে উপহার দিতে উদ্যত মেকী বামপন্থী সিপিএম সরকারের তীব্র সমালোচনা করে বক্তব্য রাখেন এস ইউ সি আই-এর নাগপুর জেলা সম্পাদক কমরেড মাধব ভোন্ডে।

মধ্যপ্রদেশ

সারা ভারত প্রতিবাদ দিবসে ভোপালের নিউ মার্কেট চৌরাস্তার মোড়ে বিক্ষোভ সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় বক্তব্য রাখেন পার্টির মধ্যপ্রদেশ রাজ্য কো-অর্ডিনেটর কমরেড উমাপ্রসাদ।

উত্তরপ্রদেশ

এলাহাবাদ জেলা সংগঠনী কমিটির উদ্যোগে শহরের কেন্দ্রস্থল সিভিল লাইনের সুভাষ মোড়ে বিক্ষোভ প্রদর্শন করা হয়। বিক্ষোভ সমাবেশে পশ্চিমবঙ্গের অত্যাচারী মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের কুশপুতুল পোড়ানো হয়। কর্মসূচিতে নেতৃত্ব দেন জেলা সংগঠনী কমিটির ইনচার্জ কমরেড এস কে মালব্য।

সর্বভারতীয় স্তরে বুদ্ধিজীবীদের প্রতিবাদ

উন্নয়নের নামে, কেন্দ্রীয় সরকারের সক্রিয় মদতে রাজ্য সরকারগুলি যেভাবে বিরাট সংখ্যক মানুষকে জীবনজীবিকা থেকে উচ্ছেদ করে জমি কেড়ে নিচ্ছে এবং সেই পরিপ্রেক্ষিতে পশ্চিমবঙ্গে টাটাদের অন্যায় আবদারের কাছে আত্মসমর্পণ করে রাজ্য সরকার যেভাবে গরিব চাষী ও খেতমজুরদের জীবিকা কেড়ে নিচ্ছে তাতে দেশের প্রথম সারির বুদ্ধিজীবীরা গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন।

রবি রায় (লোকসভার পূর্বতন স্পিকার), কৃষ্ণ আইয়ার (অবসরপ্রাপ্ত বিচারক, সুপ্রিম কোর্ট), রজনী কোঠারী (পূর্বতন সদস্য, প্ল্যানিং কমিশন), দেবব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় (পূর্বতন ভূমি সংস্কার কমিশনার), এস পি শুক্ল (প্ল্যানিং কমিশনের পূর্বতন সদস্য) সহ ১৮ জন প্রথম সারির বুদ্ধিজীবীর স্বাক্ষরিত প্রতিবাদপত্র সংবাদমাধ্যমে প্রকাশের জন্য পাঠিয়েছেন ভারত সরকারের পূর্বতন বিদেশ সচিব মুচকুন্দ দুবে।

তাঁরা বলেছেন — বিপুল সংখ্যক পুলিশ মোতায়েন করে কঠোর অত্যাচার সত্ত্বেও চাষীরা জমি দখল প্রতিরোধ করছে, যে খবর কায়েমী স্বার্থের রক্ষক প্রভাবশালী সংবাদমাধ্যমগুলি চেপে দিচ্ছে।

তাঁরা বলেছেন, রাজ্য সরকারের উচিত পরিষ্কার বলা যে বিপুল সংখ্যক মানুষ, বিশেষত কৃষিজীবীদের উচ্ছেদ করে রাজ্যে শিল্পায়ন হতে পারে না। শিল্পপতি মহলকে খুশি করার পথ ছেড়ে রাজ্য সরকারের উচিত অবিলম্বে অত্যাচার বন্ধ করা।

স্পেশাল ইকনমিক জোন, তৎসংক্রান্ত আইন সহ সবরকম জমি অধিগ্রহণ সম্পর্কে জাতীয় স্তরে সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য নিরপেক্ষ কমিশন গঠন ও তা না হওয়া পর্যন্ত সবরকম জমিদখল বন্ধ রাখার দাবি তাঁরা জানিয়েছেন।

হরিয়ানায় রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের বিশাল সমাবেশ

জেপিএ-র কেন্দ্রীয় সাধারণ পরিষদের সভা উপলক্ষে গত ১১ নভেম্বর রোহটকে হরিয়ানা রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের এক বিশাল সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। সত্যিই এই সমাবেশ ছিল অভূতপূর্ব, উৎসাহব্যঞ্জক ও শিক্ষণীয়, যা সমস্ত কর্মচারী সমাজ ও এলাকার সাধারণ মানুষের মধ্যে গভীর ছাপ ফেলেছে। রোহটকের সাধারণ মানুষ যাঁরা এই সমাবেশের জন্য দীর্ঘক্ষণ রাস্তার দু'ধারে দাঁড়িয়েছিলেন তাঁদের সকলেই বলেছেন, হরিয়ানাতে সরকারি কর্মচারী ও অঙ্গনওয়াড়ী কর্মীদের এতবড় সমাবেশ এর আগে কখনও দেখেননি। এই সমাবেশ সংগঠিত করেছিল জেপিএ অনুমোদিত 'হরিয়ানা সংযুক্ত কর্মচারী মঞ্চ — গত ২০ মার্চ হরিয়ানার মুখ্যমন্ত্রীকে দেওয়া ২৫ দফা দাবিপত্রের মীমাংসার উদ্দেশ্যে। হরিয়ানা রাজ্যের সরকারি সমস্ত দপ্তর, বোর্ড, করপোরেশন ও সমস্ত জেলা থেকে প্রায় ৩০ হাজারের বেশি কর্মচারী (শিক্ষক ও অঙ্গনওয়াড়ী কর্মী-সহায়িকা সহ) এই সমাবেশে যোগ দেন। সভাপতিত্ব করেন সংযুক্ত মোর্চার সভাপতি ও শিক্ষক আন্দোলনের বর্ষীয়ান নেতা কর্তার সিং মালিক। সভা পরিচালনা করেন সংযুক্ত মোর্চার সাধারণ সম্পাদক শিবকুমার পরাসর। কর্মচারীদের প্রতি ব্যাপক বঞ্চনার বিরুদ্ধে এই বিক্ষোভ সমাবেশে জেলার সভাপতি ও সম্পাদকরা বক্তব্য তুলে ধরেন। হরিয়ানার অঙ্গনওয়াড়ী ওয়ার্কার্স অ্যান্ড হেল্পার্স ইউনিয়নের সভাপতি ও সম্পাদিকা যথাক্রমে পুষ্প দালাল ও জগমতি মালিক তাঁদের বক্তব্যে সিটু নেতাদের তীব্র সমালোচনা করে বলেন, নেতারা অঙ্গনওয়াড়ী কর্মী ও সহায়িকাদের কর্মচারীর মর্যাদা দেওয়ার দাবি থেকে সরে এসেছেন ও তাদের সংগঠন ভাঙার চেষ্টা করছেন।

প্রধান বক্তা জেপিএ-র সর্বভারতীয় সভাপতি কমরেড অচিন্ত্য সিনহা তাঁর বক্তব্যে বলেন — গত ২০ মার্চ কর্মচারীরা চণ্ডীগড়ে বিশাল সমাবেশের মধ্য দিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর কাছে তাদের দাবিদাওয়ার ভিত্তিতে যে স্মারকলিপি দিয়েছিলেন এবং হরিয়ানা সরকার কর্মচারীদের সাথে বৈঠক করে ঐ দাবিগুলির সুমীমাংসার যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন সেই প্রতিশ্রুতি সরকার আজও রক্ষা করেনি। শুধু তাই নয়, সরকার এমন পরিস্থিতি সৃষ্টি করেছে যাতে কর্মচারীরা অনির্দিষ্টকালীন ধর্মঘটে যেতে বাধ্য হন। কমরেড অচিন্ত্য সিনহা শ্রমিক-কর্মচারীদের আরও শক্তিশালী আন্দোলন গড়ে তোলার আহ্বান জানান।

মানিক মুখার্জী কর্তৃক এস ইউ সি আই পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির পক্ষে ৪৮, লেনিন সরণী, কলকাতা ৭০০০১৩ হইতে প্রকাশিত ও তৎকর্তৃক গণদাবী প্রিন্টার্স এ্যান্ড পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ৫২বি ইন্ডিয়ান মিরর স্ট্রীট, কলকাতা ৭০০০১৩ হইতে মুদ্রিত। সম্পাদক মানিক মুখার্জী। ফোন ঃ সম্পাদকীয় দপ্তর ঃ ৩২৯৩৬৩৪৫, ২২৪৪০২৫১ ম্যানেজারের দপ্তর ঃ ২২৪৪২২৩৪, ২২৪৪১৮২৮ ফ্যাক্স ঃ (০৩৩) ২২৪৬-৫১১৪ e-mail : suci_cc@vsnl.net Website : www.suci.in